উড়নচণ্ডী

করুণাময়ী

প্রকাশক ঃ অমিতাভ সেনগুপ্ত
"করুণাময়ী" ১০৩, কালীকুন্ডু লেন, হাওড়া-১

প্রকাশ কাল ঃ ১৯৪৮

বর্ণ সংস্থাপন ঃ কম্পিউটার এজ্, ইছাপুর ক্যানেল সাইড,
হাওড়া-৪

মুদ্রাকর ঃ অনুলিপি প্রেস, পি ১৪ চার্চ রোড, হাওড়া-১

প্রচ্ছদ ঃ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

সাধনা মুখোপাধ্যায়কে

এই লেখকের অন্যান্য বই

এলোকেশী আশ্রম
মহাপৃথিবী
সমুদ্রতীরে
প্রতিদ্বন্দ্বী
জঙ্গলগড়ের চাবি
তাজমহলে এককাপ চা
রক্তমাংস
দুই নারী
সোনালি দিন
বন্ধুবান্ধব
প্রকাশ্য দিবালোকে
গভীরগোপন
ব্যক্তিগত
কেন্দ্রবিন্দু
দর্পণে কার মুখ
মেঘ বৃষ্টি আলো
স্বপ্ন লজ্জাহীন
আকাশ দস্যু
বরণীয় মানুষ : স্মরণীয় বিচার
শ্রেষ্ঠ গল্প
শ্রেষ্ঠ কবিতা

এতে আছে

এতে আছে

অন্ধকার ঘরের চাবি ৯
উড়নচণ্ডী ৫১
ছবি ৯১

অন্ধকার ঘরের চাবি

পৃথা এলো এমন সময়, যখন আরতি বেরবার জন্য একেবারে তৈরি। আর একটু আগেই সে বেরিয়ে যেত, নেহাৎ দিল্লী থেকে বাবুনের টেলিফোন এসে গিয়েছিল।

আরতি খানিকটা ধমকের সুরে বললো, তোর আসবার কথা সাড়ে ন'টায়, আর তুই এলি এগারোটা বাজিয়ে?

পৃথার মুখ-চোখে কোনো অপরাধবোধ নেই। সে প্রায়ই দেরি করে। প্রত্যেকবারই তার কিছু না কিছু ওজোর থাকে। সে হালকাভাবে বললো, কী করবো, বাবা যে বললেন, অফিসে যাবার পথে আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। বাবাই তো দেরি করলেন!

আরতি বললো, ও দোষটা হলো তোর বাবার? কেন, তুই বাসে আসতে পারিস না?

হাতের বইগুলো ধপ করে একটা সোফার ওপর ফেলে দিয়ে পৃথা বললো, পারবো না কেন? রোজই তো আসি। কিন্তু গাড়িতে আসার চান্স পেলে কে আর ভিড়ের বাসে চাপতে চায় বলো! আমার পয়সাটাও বেঁচে গেল।

আরতি বললো, কিন্তু আমাকে যে এক্ষুণি বেরুতে হবে।

পৃথা বললো, কোথায় যাবে? এই সময় তো কোনোদিন তুমি যাও না কোথাও!

আরতি বললো, একটা শাড়ি কিনতে যাচ্ছি। যেতেই হবে, উপায় নেই রে!

পৃথা দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বললো, ওমা, তোমার বুঝি একটাও শাড়ি নেই? এক্ষুণি একটা না কিনলে চলবে না!

আরতিও এবার হেসে ফেলে বললো, ধ্যাৎ পাজি মেয়ে! কাল একটা বিয়ের নেমন্তন্ন আছে, সেইজন্য একটা শাড়ি কিনবো.... কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী, আমার ননদকে বলেছি, সে গড়িয়াহাটে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে ঠিক এগারোটার সময়, সে অলরেডি এসে গেছে, দু'জনে পছন্দ করবো।

পৃথা বললো, ওরে বাবা, দু'জনে মিলে পছন্দ করে একখানা শাড়ি

কিনবে ? অন্তত পঞ্চাশখানা শাড়ি তো দেখা হবেই ! আজ ওখানকার শাড়ির দোকানদারদের কপালে দুঃখ আছে।

আরতি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললো, তুই এসে পড়েছিস যখন বোস। নিজে পড়াশুনো কর। আমি ঘুরে আসি।

পৃথা বললো, অন্তত দু'ঘন্টা ?

আরতি বললো, দুপুরে ফিরে এসে খাবো তো। তুইও আজ আমাদের সঙ্গে খেয়ে নিবি ? আমি আর দেরি করতে পারছি না। চলি রে। কেউ বেল দিলে আগে দেখে নিয়ে তবে খুলবি।

আরতি বেরিয়ে যাবার পরেই ফ্ল্যাটটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তিনতলা বাড়ির এক একতলার এক একজন মালিক। আরতিদের ফ্ল্যাটটা তিনতলায়, অনেক জায়গা, গোটা চারেক ঘর, একটা বেশ বড় হল, সামনের দিকে টানা বারান্দা।

অন্যদিন এ বাড়িতে দু'-তিনজন কাজের লোক দেখেছে পৃথা, আজ কেউ নেই কেন ? রান্নাঘরটাও বন্ধ।

এই তুলনায় পৃথাদের ফ্ল্যাটটা ছোট। ওরা তিন ভাই বোন, তাছাড়া ওদের এক পিসি থাকে বাড়িতে, সব সময় একটা হৈ চৈ-এর ভাব থাকে। পৃথার বাবার চেঁচিয়ে কথা বলা স্বভাব। সাধারণ কথাও দূর থেকে শুনলে মনে হয় রাগারাগি করছেন। সেই তুলনায় এই বাড়িটা কত শান্ত। এই রকম একটা ফাঁকা বাড়িতে পৃথার খুব থাকতে ইচ্ছে করে।

হল ঘরটার ডান পাশে আরতিদের বেডরুম। সে দরজাটাও খোলা। বিছানার ওপর বেডকভারটার ঠিক মাঝখানে এমব্রয়ডার করা একটা বিশাল পদ্মফুল। ভারি সুন্দর। স্টিলের আলমারির গায়ে চাবি ঝুলছে।

পৃথা চলে এলো রান্নাঘরে। গ্যাস জ্বেলে কেটলিতে জল চাপালো। এখন তার পড়াশুনো করার কথা, কিন্তু আগে এক কাপ চা খেয়ে নিতে হবে। চা-চিনি কোথায় থাকে পৃথা জানে। এ বাড়ির সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা নেই, তবু এ বাড়ির অনেক কিছুই সে জেনে গেছে।

পিওর ম্যাথমেটিক্সে এম ও পাশ করেছিল আরতি। বিয়ের পর অনেক দিন সে বিদ্যে কাজে লাগেনি। প্রথম তিন বছরেই দুটি বাচ্চা জন্মে যায়, তখন তাদের মানুষ করাই প্রধান কাজ। বাচ্চা মানুষ করতে গেলে উচ্চাঙ্গের অঙ্ক জানার কোনো প্রয়োজন হয় না। বরং সবরকম অঙ্কই তখন গুলিয়ে যায়। বাচ্চারা কখন কাঁদবে, কখন জুতো খেয়ে ফেলবে, কখন খাট থেকে পড়ে যাবে, কখন ঘুমোবে, কখন জাগবে, তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই।

একটি ছেলে, একটি মেয়ে। তারা দু'জনে ভালোই মানুষ হয়েছে। ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি করছে রাঁচিতে, শীগগির সে বিলেতে যাবে। মেয়ে এম এ পড়তে গেছে দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওদের দু'জনেরই বান্ধবী ও বন্ধু ঠিক হয়ে আছে, কিন্তু বিয়ে করতে চায় না এখনই।

ছেলে আর মেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পরেই আরতি অনুভব করলো, সারাদিন তার কোনো কাজ নেই। এর আগে ছেলে-মেয়ের বন্ধু-বান্ধবীরা আসতো সব সময়, বাড়ি গমগম করতো। এখন বাড়ি একেবারে নিঃশব্দ। রজত অফিস থেকে ফেরে প্রায় রাত দশটায়, বরাবরই তার এরকম দেরি হয়, মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরেও যেতে হয় তাকে। তখন আরতি আবিষ্কার করলো, তার কিছু কাজ দরকার। এখন আর অফিস-টফিসে কাজ নেওয়া সম্ভব নয়, তবে অঙ্কের জ্ঞানটা কাজে লাগানো যায়। মস্তিষ্কের কোণে অঙ্ক একবার ঢুকলে আর সহজে বিদায় নেয় না।

কাগজে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন দিতেই দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী আসতে লাগলো।

প্রথমবারে আরতি কারুকেই ফেরায়নি, ছোট ছোট ব্যাচ করে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অঙ্ক শেখাতে লাগলো। দারুণ পরিশ্রম, আবার মজাও পাচ্ছিল বেশ! দেখা গেল, বাড়িতে বসে টিউশানি করে তার রোজগার রজতের প্রায় সমান সমান! আরতি অবশ্য সব ছাত্র-ছাত্রীদেরই চা জলখাবার দেয়।

এরপর আর বিজ্ঞাপন দিতে হয় না। পুরানোদের কাছে খবর পেয়েই নতুনরা আসে। দ্বিতীয় বৎসরে রজত অবশ্য আপত্তি জানালো। সারাদিন ধরে পড়াবার কোনো মানে হয় না। তাদের এত বেশি পয়সার দরকার নেই। তা ছাড়া সর্বক্ষণ বাড়িতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়। অন্য কোনো অতিথি বা বন্ধু-বান্ধব আসতে পারে না, এমনকি রজতও আরতির সঙ্গে কথা বলার সময় পায় না।

তখন ঠিক হলো, ফি বাড়ানো হবে, আর বেছে বেছে শুধু অনার্সের ছেলেমেয়ে নেওয়া হবে। পড়ানো হবে সপ্তাহে চার দিন, আর তিন দিন আরতির বাধ্যতামূলক ছুটি। না হলে তার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

একমাত্র পৃথার কথা আলাদা। সে যে-কোনো দিন যখন তখন আসতে পারে। পৃথার ছোট মাসি মিলি যে আরতির প্রাণের বন্ধু! মিলির সঙ্গে আরতির সব গোপন কথার বিনিময় হয়। পৃথার কাছ থেকে পয়সা নেবারও

প্রশ্ন ওঠে না। পৃথার মা অবশ্য জোর করে আরতির জন্য মাঝে মাঝে শাড়ি কিংবা বেডকভার উপহার পাঠান। পৃথা এখানে যখন খুশি আসতে পারে।

চায়ের জল ফুটে গেছে, শোঁ-শোঁ করে শব্দ হচ্ছে। পৃথা চা-পাতা, চিনি আগেই বার করে রেখেছে, শুধু দুধ পায়নি। ফ্রিজে দুধ নেই। হয়তো অন্য কোথাও গুঁড়ো দুধ আছে, যাকগে, কালো চা-ই খাওয়া যাবে। এক টুকরো লেবু কেটে নিল সে।

চায়ের কাপটা নিয়ে পৃথা আরাম করে বসলো সোফায়।

বেশিরভাগ সময় শাড়ি পরে না পৃথা, প্যান্টের ওপর ঢোলা জামা। তার মাথায় অনেক চুল, কেটে ফেলার খুব ইচ্ছে কিন্তু তার মায়ের কঠিন নিষেধ। এম.এ. পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই পৃথা দিল্লীতে তার ছোটমামার বাড়িতে গিয়ে অন্তত দু'মাস থাকবে। তখন চুল কাটবেই।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে পৃথা তার অঙ্কের খাতা খুললো। আঃ, এই রকম নির্জন বাড়িতে পড়াশুনো করতে পারলে সত্যিকারের মন বসে। পৃথাদের বাড়িতে সে সুযোগই নেই। ভাই-বোনদের চ্যাঁচামেচি, পিসিমার বকবকানি আর বাবা-মায়ের ঝগড়া! সব স্বামী-স্ত্রীই কি বেশি বয়েস হলে এরকম ঝগড়া করে? রজত আর আরতিকে তো সে কখনো রাগারাগি করতে দেখেনি? অবশ্য বাইরের লোকের সামনে.... বেডরুমে ওঁরা কী করেন তা পৃথা কী করে জানবে?

অন্যমনস্কভাবে জামার একটা বোতাম ঘোরাতে ঘোরাতে পৃথা খাতাটা পড়তে লাগলো। একটু বাদেই মন বসে গেল তার। আরতি কখন ফিরবে ঠিক নেই। দু'জনে মিলে শাড়ি পছন্দ করা অতি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!

হঠাৎ দরজায় বেল বেজে উঠলো।

পৃথা খাতা থেকে চোখ তুলে একটুক্ষণ চেয়ে রইলো দরজার দিকে। খোলা উচিত কি উচিত না? আরতি মাসি বেরিয়ে যাবার পর বাড়িতে আর কারুর থাকার কথা নয়। পৃথা হঠাৎ এসে পড়েছে। আরতি মাসির আত্মীয়দের সে চেনে না। কাকে ভেতরে ঢোকানো উচিত সে জানবে কী করে? পৃথা না থাকলে তো দরজা খোলার প্রশ্নই উঠতো না।

আরও জোরে জোরে বেল বাজতে লাগলো। তীক্ষ্ণ শব্দটা কানে লাগে। কতক্ষণ এরকম বাজিয়ে যাবে? পৃথা এবার উঠে গিয়ে দরজার লক-এ হাত দিল। যে-ই আসুক, সে ভেতরে ঢুকতে দেবে না।

দরজা খুলেই সে দেখলো, কাপড়ের গাঁঠরি কাঁধে এক ধোপা।

এই রে, ধোপা অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তি, কিন্তু আরতি মাসি কাচবার কাপড়-চোপড় কোথায় রেখেছেন, তা পৃথা কী করে জানবে? ধোপারা একবার ফিরে গেলে সাত দিনের আগে আর আসে না।

পৃথা বললো, মাইজী তো বাড়ি নেই! আউর কোই নেই। তুম্ দু'ঘণ্টা বাদমে আয়ে গা?

লোকটি বললো, দো ঘণ্টা?

তারপর ঘন ঘন দু'দিকে মাথা দোলালো।

পৃথা বললো, দুপুরমে? বিকালমে?

লোকটি বিড়বিড় করে কী যেন বললো, তারপর পেছন ফিরলো।

পৃথা নিরুপায়। আরতি মাসি তো তাকে ধোপার বিষয়ে কিছু বলে যায়নি। ধোপা যদি আজ আর ফিরে না আসে, তা হলে আরতি মাসি রাগ করতেই পারে। কিন্তু পৃথার তাতে দায়িত্ব কতখানি!

দরজাটা বন্ধ করে পেছন ফিরতেই পৃথা চমকে উঠলো। আর একটু হলেই সে আঃ শব্দ করে ফেলতো। হল ঘরটার এক কোণে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক পুরুষমূর্তি। দীর্ঘকায়, সুপুরুষ, একটা প্যান্ট পরা, খালি গা, কপাট বক্ষ, চশমাটা চোখ থেকে সরিয়ে কপালের ওপর তোলা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, দৃষ্টিতে খানিকটা বিস্ময়-মাখানো কৌতুক।

অচেনা কেউ নয়, রজত। কিন্তু পৃথা এতক্ষণ ধরে ধারণা করে রেখেছিল যে ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই, আরতি মাসিও কিছু বলে যায়নি, সেই জন্যই সে এত অবাক হয়েছে।

রজত জিজ্ঞেস করলো, তুমি কখন এলে, পৃথা!

এ কথার উত্তর না দিয়ে পৃথা বললো, এই রে, ধোপা যে ফিরে গেলো? এখনো যায়নি বোধহয়, ডাকুন, ডাকুন!

রজত বললো, ধোপা? তাকে ডেকে আমি কী করবো? কোথায় জামা-কাপড় থাকে তা কি আমি জানি? ওর গরজ থাকলে ঠিক ফিরে আসবে। আরতি কখন বেরুলো?

পৃথা বললো, এই পনেরো-কুড়ি মিনিট আগে!

রজত একটু এগিয়ে এসে সেন্টার টেব্‌ল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে বললো, আমি ডার্করুমে কাজ করছিলাম। এতক্ষণ ধরে টং টং করে বেল বাজতে লাগলো, ভাবলাম বাড়িতে দরজা খোলার কেউ নেই নাকি? বেরিয়ে এসে দেখি, দরজার কাছে একটা অচেনা মেয়ের পিঠ! মানে, তুমি অচেনা নও, কিন্তু পিঠটা যে আরতির নয়, সেটাই ভেবেছিলাম।

আরতি তোমাকে একা বসিয়ে রেখে চলে গেছে?

রজতের ছবি তোলার শখ। একটা ঘরের দরজা-জানলা কালো পর্দায় ঢেকে সে ডার্করুম বানিয়েছে, নিজেই ছবি ডেভেলাপ করে।

রজতের চোখ চায়ের কাপটার দিকে।

পৃথা বললো, হ্যাঁ, আরতি মাসি বললো যে আপনার বোনের সঙ্গে কোথায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমাকে বসতে বললো। আমি বেশ নিজে নিজে বানিয়ে চা খেলাম। আপনাদের রান্নার মেয়েটি কোথায় গেল?

রজত বললো, ছুটি নিয়েছে বোধহয়। দেকান থেকে খাবার কিনে আনা হচ্ছে। ইস্ তুমি চা বানালে, আমাকে একটু দিলে না?

পৃথা বললো, আমি কী করে জানবো? এতক্ষণ আপনার কোনো সাড়াশব্দও পাইনি। আবার চা বানিয়ে দেবো? দুধ নেই কিন্তু!

রজত বললো, আমি দুধও খাই না, চিনিও খাই না। কিন্তু তুমি আবার কষ্ট করবে?

পৃথা আবার রান্নঘুরে ঢুকে গ্যাস জ্বাললো। চারদিক দেখে মনে হচ্ছে, সকাল থেকে কিছু রান্না হয়নি। আরতি মাসি যে বললো, দুপুরে পৃথাকেও খেয়ে যেতে? নিজেদেরই তো খাবার ব্যবস্থা নেই দেখা যাচ্ছে। সকালে আরতি এক ব্যাচ ছাত্র-ছাত্রীকে পড়িয়েছে, নিজে রান্নার সময় পাবে কী করে? লোক না থাকলে খুবই অসুবিধে।

রজত রান্নাঘরে দিকে আসেনি, সে বসবার ঘরে কাগজপত্র দেখছে। পৃথা চা বানিয়ে আনবার পর রজত স্মিতহাস্যে বললো, থ্যাংক ইউ, ইয়াং লেডি। আমি তো অঙ্ক কিছু বুঝি না, তোমায় কোনো সাহায্য করতে পারবো না। আমি ডার্করুমে ফিরে যাই, তুমি পড়াশুনো করো? আমি এখানে বসে গল্প শুরু করলে তোমার সময় নষ্ট হবে।

পৃথা বললো, একটুখানি গল্প করলে এমন কিছু... সব সময় তো পড়াশোনা করা যায় না!

রজত বললো, নাঃ, তোমাকে ডিস্টার্ব করবো না। তুমি যা করছিলে কর। কেউ যদি এসে বেল বাজায়, আমিই দরজা খুলে দেবো এসে!

চায়ের কাপটা হাতে নিয়েই ফিরে যেতে যেতে রজত আবার থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার ডাক নাম কী পৃথা? নিশ্চয়ই একটা কিছু ডাক নাম আছে।

পৃথা বললো, আমার ডাক নাম পিউ!

রজত দু'বার আপন মনে বললো, পিউ, পিউ, বাঃ!

তারপর সে ঢুকে গেল তার অন্ধকার ঘরে।

তা হলে ফ্ল্যাটটা মোটেই খালি নয়। পৃথা ছাড়াও রয়েছে একজন পুরুষ। অবশ্য এই পুরুষটির বয়েস পৃথার বয়েসের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি, রজতের বয়েস চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন হবেই! পৃথার বাবার বয়েসী। অবশ্য রজতের স্বাস্থ্য ভালো, তাকে এখনো অনেকটা যুবকের মতন দেখায়।

রজত অত্যন্ত ভদ্র, পৃথার পড়াশুনোর যাতে ক্ষতি না হয় সেইজন্য ভেতরে চলে গেল। তবু একটু আগেকার সঙ্গে এখনকার একটা তফাৎ ঘটে গেছে। একদম ফাঁকা বাড়ির অনুভূতি, আর অনেক দূরে হলেও একটা ঘরে একজন কেউ আছে, এ কখনো এক হতে পারে না।

হঠাৎ পৃথার ডাক নাম কেন জিজ্ঞেস করলো রজতদা?

এই একটা ব্যাপার! আরতি পৃথার ছোট মাসির বন্ধু, সেইজন্য তাকে সে প্রথম থেকেই আরতি মাসি বলে। এ বাড়িতে আসতে শুরু করে প্রথম কয়েকদিন রজতকে সে দেখেইনি। যখন ব্যাচ বাই ব্যাচ ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে আসে, রজত তখন তাদের কারুর সঙ্গেই কথা বলে না। কিন্তু পৃথা একা আসে, তার কথা আলাদা, তার সঙ্গে রজতের একদিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আরতি। পৃথা স্বাভাবিকভাবেই তাকে মেসোমশাই বলে ডেকেছিল। তা শুনে রজত আঁতকে উঠে বলেছিল, না, না, আমি মেসোফেসো হতে পারবো না। মেসোমশাই শুনলেই কেমন যেন গোঁফওয়ালা আর পাম্প-শু পরা ভদ্রলোক মনে হয়। তুমি আমায় রজতদা বলবে। আরতি আপত্তি করলেও সেটাই চলে আসছে। রজতদা আর আরতি মাসি!

ডার্করুমে কি পুরো অন্ধকার থাকে? অন্ধকারের মধ্যে অতক্ষণ ধরে ছবি ডেভেলাপ করতে ভালো লাগে? দম আটকে আসে না?

পৃথার হঠাৎ মনে পড়লো তার বন্ধু অপালার কথা। অপালা একটা সাঙ্ঘাতিক অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল। সেটা এমনই গোপন যে আর কারুকে বলা যায় না, পৃথা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আরতি পৃথার আপন মাসি নয়। অপালা গিয়েছিল নিজের মাসির বাড়ি চন্দননগরে। সেই মাসি আর মেসো অপালাকে জন্ম থেকে দেখছে। চন্দননগরের ঐ মাসির বাড়ি অপালার প্রায় নিজের বাড়ির মতন। একদিন দুপুরে মাসিরা কোথায় বেরিয়েছেন, অপালা ঠিক পৃথার মতনই পড়াশুনো করার জন্য থেকে গিয়েছিল। হঠাৎ মেসো কেন যেন সেই সময় বাড়ি ফিরলেন। নির্জন দুপুর, বাড়িতে শুধু অপালা আর মেসো। একটু বাদে তিনি অপালার সঙ্গে নানান ঠাট্টাইয়ার্কি করে পড়াশুনোর ব্যাঘাত ঘটাতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ এক

সময় অপালাকে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেতে গেলেন। মেসো এরকম ব্যবহার কোনোদিন করেননি, কোনোদিন সামান্য ইঙ্গিতও দেননি, প্রথমে চমকে গেলেও অপালা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মেসো জোর করে চেপে ধরে, তার বুকে হাত দিয়ে...। তারপর অপালা অনেক কেঁদেছে। এ কথা মাসিকে বলে দেওয়া যায় না, মাকে বলা যায় না। তাহলে একটা সাংঘাতিক অশান্তি শুরু হয়ে যাবে। অপালা বলেছিল, নির্জন বাড়িতে পুরুষ মানুষদের মাথা খারাপ হয়ে যায়!

এই ঘটনাটা মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারছে না পৃথা। আজও তো সেই একই রকম পরিবেশ। কিন্তু রজতদা সেরকম কোনো ইঙ্গিতই দেননি। কেমন সহজ, স্বাভাবিক, ভদ্র ব্যবহার করলেন। সব পুরুষমানুষ কখনো এক হতে পারে না।

পড়ায় মন বসছে না। বারবার সে চোখ তুলে চাইছে, যেন ডার্ক রুম থেকে বেরিয়ে আসবে রজতদা। অথচ ওদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। আর একবার চা বানালে কেমন হয়? রজতদা খুব বেশি চা খায়, তা পৃথা জানে। রজতদার জন্যও চা বানিয়ে নিয়ে গিয়ে চমকে দেবে?

কিন্তু পৃথা উঠলো না। পরীক্ষার আর মাত্র একুশ দিন বাকি, এখন অন্যমনস্ক হলে চলবে কেন? এক ঘণ্টা হয়ে গেছে, আরতি মাসির ফেরার নাম নেই। আর কেউ দরজায় বেল দিচ্ছেও না।

একটু বাদে পৃথা বই-খাতা বন্ধ করে চুপ করে বসে রইলো।

তার মনের মধ্যে যে-ইচ্ছেটা উঁকি মারছে, সেটাকে সে ঠিক যাচাই করতে পারছে না। অন্ধকার ঘরে অ্যাসিডে নেগেটিভ ডুবিয়ে রাখলে আস্তে আস্তে ছবি ফুটে ওঠে, এ ব্যাপারটা পৃথা কখনো দেখেনি। তাদের বাড়িতে কারুর ছবি তোলার শখ নেই। এখন যদি সে রজতদার কাছে দেখতে চায়, সেটা খারাপ কিছু? আরতি মাসি এর মধ্যে ফিরে এলে অন্যরকম ভাববেন?

কেন খারাপ হবে? বাবার বয়েসী একজন পুরুষ, তার কাছে স্বাভাবিক-ভাবে গিয়ে পৃথা দাঁড়াতে পারে না? যে কোনো বয়েসের নারী ও পুরুষের মধ্যে কি শুধু শরীরের সম্পর্ক? নাঃ তা হতেই পারে না। পৃথা পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

উঠে গিয়ে সে ডার্করুমের দরজায় ঠকঠক করলো।

রজত যেই দরজা খুললো, অমনি ইচ্ছেটা বদলে গেল পৃথার। লজ্জায় যেন কুঁকড়ে গেল খানিকটা, দু'-এক মুহূর্ত বলতে পারলো না কিছুই।

ঘরটা পুরোপুরি অন্ধকার নয়। ভেতরে একটা লাল রঙের আলো

জ্বলছে। টেবিলের ওপর কয়েকটা পোরসিলিনের পাত্র। ক্লিপ দিয়ে টাঙানো রয়েছে কয়েকটা নেগেটিভ।

রজত জিজ্ঞেস করলো, কী পিউ?

পৃথা বললো, আরতি মাসি তো আসছে না। আরও দেরি হবে মনে হচ্ছে। 'আমি এখন চলে যাচ্ছি।

রজত বললো, একটা শাড়ি কেনার নাম করে বেরিয়েছে, অন্তত তিনটে শাড়ি না কিনে কি আর ফিরবে? তার জন্য ঘুরবে অন্তত তেত্রিশটা দোকান।

পৃথা বললো, আপনি তা হলে বলে দেবেন, আমি আবার কাল আসবো।

রজত বললো, ঠিক আছে, একা একা তুমি আর কতক্ষণ বসে থাকবে!

পৃথা বললো, আপনি আজ অফিস যাননি? ছবির কাজ করছেন, এই ছবিগুলো খুব জরুরি বুঝি?

রজত বললো, হ্যাঁ। বেশ ভালো এসেছে ছবিগুলো। দেখবে?

রজতের আহ্বানে পৃথা সেই আধো অন্ধকার ঘরে পা দিল।

রজতের চাকরির সঙ্গে ছবি তোলার কোনো সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে সে ছবি তুলে একজিবিশানে পাঠায়। দু'-একটা প্রাইজও পেয়েছে। মানুষের ছবি তোলে না সে, শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য।

প্রিন্ট করা হয়নি, শুধু ডেভেলাপ করা নেগেটিভ দেখে ছবি বোঝা সহজ নয়। রজত তবু এমনভাবে বোঝাতে লাগলো, যেন পৃথাও একজন বিশেষজ্ঞ। ফ্রেমিং ফোকাস, হাই লাইট এসব কিছুই জানে না পৃথা। তবু রজত তাকে সমান সমান মর্যাদা দিচ্ছে।

ঘরটা ছোট, তাও প্রায়ান্ধকার, জিনিসপত্র তোলার সময় দু'একবার রজতের হাত লেগে যাচ্ছে পৃথার শরীরের নানান জায়গায়। রজতের এতখানি উৎসাহ দেখে পৃথার একটু একটু সন্দেহ হলো। এসবই তাকে ভোলাবার চেষ্টা। এরপর একসময় রজতের হাত তার কোমর জড়িয়ে ধরবে, তাকে কাছে টানবে। টানুক না, পৃথা দেখিয়ে দেবে মজা। সে অপালার মতন অত নরম নয়।

কিন্তু রজত একবারও অশোভনভাবে পৃথাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করলো না। অনেকগুলো ছবি দেখাবার পর সে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কেমন লাগছে, পিউ?

পৃথা বললো, আমার আজ একটা নতুন অভিজ্ঞতা হলো।

॥ ২ ॥

পৃথার বাবা বাসুদেব একজন খামখেয়ালি মানুষ। নিজে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, জার্মানিতে ছিলেন কয়েক বছর, ভালো চাকরি নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। কিন্তু এক জায়গায় তিনি বেশিদিন টিঁকতে পারেন না। ঘনঘন চাকরি বদল করতে তাঁর ক্লান্তি নেই। বাচ্চা বয়েসে পৃথারা বাবার সঙ্গে সঙ্গে কানপুর, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ এরকম কত জায়গায় ঘুরেছে। নতুন নতুন বাসস্থান। পৃথার মা রেখা নিজের হাতে ফুলগাছ লাগান, সে গাছে ফুল ফোটার আগেই আবার বাসা বদল। রেখা এই জন্য বকাবকি করতেন স্বামীকে, বাসুদেব হা-হা করে হাসতেন। পরের চাকরিটা যে কত লোভনীয়, তা বোঝাতেন সবিস্তারে। আবার সে চাকরি ছেড়ে এক বছরের মধ্যেই প্রস্থান।

শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ফেরা হলো বটে, তাতেও স্বস্তি নেই। চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাসুদেব এবার শুরু করলেন নিজস্ব ব্যবসা। বেহালার কাছে একটা ছোট কারখানা স্থাপন করলেন গোটা দশেক শ্রমিক নিয়ে, বাসুদেব নিজেও মেশিনপত্রে হাত লাগান ওদের সঙ্গে।

কিন্তু পশ্চিমবাংলায় তখন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পতন শুরু হয়ে গেছে। বাসুদেব একা তা সামলাবেন কী করে? ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ নেই, উৎপাদন বন্ধ, অথচ শ্রমিকদের তো মাইনে দিতেই হবে, তাদেরও সংসার আছে। ঘেরাও, অবরোধ, বন্‌ধ এই সব রাজনৈতিক অস্ত্রগুলিতে যে উৎপাদন ব্যাহত হয়, তার ধাক্কা লাগে সাধারণ মানুষেরই ওপর। তা আর কে বোঝে! বাসুদেব প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছেন। নিজের যথাসর্বস্ব ঢেলে দিয়ে চেষ্টা করছেন কারখানাটাকে বাঁচিয়ে রাখার। কখনো দু'-তিন মাস অবস্থা একটু ভালো হয়, আবার হঠাৎ হঠাৎ দুঃসময় আসে।

রেখার মনে শান্তি নেই। আগে তিনি ছিলেন এক বড় অফিসারের স্ত্রী, স্বামীর চাকরি সূত্রে যে-শহরেই থেকেছেন, পেয়েছেন সুদৃশ্য বাংলো, তিন-চারজন কাজের লোক, যখন ইচ্ছে ড্রাইভার সমেত গাড়ি। নিশ্চিত জীবন। এখন তাঁর স্বামী স্বাধীন ব্যবসা করছেন, এখন থাকতে হয় ছোট ফ্ল্যাটে, কাজের লোক মাত্র একজন, যখন তখন নিউ মার্কেটে গিয়ে কেনাকাটি করা যায় না, হাতে টাকা থাকে না। মাঝখানে বাসুদেব প্রায় দেড় মাস গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন জানা গেল বাসুদেবের প্রচুর ধার রয়েছে ব্যাঙ্কে, কর্মচারীরা মাইনে না পেয়ে বাড়িতে এসে বিক্ষোভ জানালো। আতঙ্কে রেখার তখন ঘুম হতো না।

এখন অবশ্য বাসুদেব আবার অনেকটা সামলে নিয়েছেন।

বাচ্চা বয়েসে তিন ভাই-বোনের মধ্যে পৃথাই ছিল বাবার সবচেয়ে আদরের। প্রত্যেকদিন সকালে এবং সন্ধের পর অফিস থেকে ফিরে বাসুদেব কিছুক্ষণ খেলা করতেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। বিদেশের রোমাঞ্চকর গল্প শোনাতেন। পৃথার চোখে তার বাবা ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। আর যত লোক সে দেখে তাদের সকলের চেয়ে তার বাবা সুন্দর, রাজা-মহারাজাদের মতন গমগমে গলা। বাবা কক্ষণো বকুনি দেন না, এমনকি মা নালিশ করলেও বাবা হাসতেন।

সময় মানুষকে কত বদলে দেয়! অন্যের অধীনে চাকরি করবেন না বলে বাসুদেব স্বাধীন ব্যবসা শুরু করলেন, কিন্তু এমনই পোড়া দেশের অবস্থা, চতুর্দিকে শুধু বাধা। দুশ্চিন্তায় ডায়াবিটিস হয়ে গেছে বাসুদেবের। চেহারাটা শুকিয়ে গিয়ে টাক পড়ে গেছে মাথায়, সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। ছেলেমেয়েদের জন্য এখন আর তাঁর একটুও সময় নেই। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে যে সংসার, এদের ভালোভাবে রাখবার জন্যই তো তিনি এত খাটছেন, অথচ এই সংসারে তিনি নিজে থাকেন কতক্ষণ? পৃথা এখন সকালবেলা বাবাকে গম্ভীরভাবে কাগজ পড়তে দেখে আর রাত্তিরবেলা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া শুনতে পায়।

পৃথার নিজস্ব ঘর নেই, তার দুই ভাইও এ ঘরে পড়াশুনো করে। রাত্তিরে ছোট ভাইটা এ ঘরেই শোয়। ভাইদের বন্ধুটন্ধু এলে পৃথাকে এ ঘর থেকে চলে যেতে হয়। পৃথার কোনো বন্ধু এলে ভাইরা ঘর ছাড়তে চায় না। এই নিয়ে ছোটখাটো ঝগড়া লেগেই আছে।

দুপুরবেলা বেশ মন দিয়েই পড়াশোনা করছিল পৃথা। হঠাৎ মনটা কেমন ছটফট করে উঠলো। একটানা খুব বেশিক্ষণ সে পড়তে পারে না। মাঝে মাঝে বই-খাতা ছেড়ে দিয়ে সে ভি.সি.আর.-এ একটা ফিল্ম দেখে কিংবা অকারণেই আর একবার স্নান করে নেয়।

পৃথা শাড়ি বদলে চুল আঁচড়াতে এলো মায়ের ঘরে।

রেখা জিজ্ঞেস করলেন, তুই এখন বেরুচ্ছিস নাকি?

আয়নার দিকে তাকিয়েই পৃথা উত্তর দিল, হ্যাঁ।

একটু ইতস্তত করলেন রেখা। এম.এ. পড়ছে মেয়ে, তার যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞান আছে। পড়াশুনোয় বেশ ভালো পৃথা, ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার খুব চেষ্টা করছে, আরতির ধারণা পৃথা তা পেয়ে যাবে। সুতরাং সে নিশ্চয়ই সময় নষ্ট করবে না। তবু মায়ের মনের সংস্কার যেতে চায় না।

রেখা জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, এই দুপুরবেলা কোথায় যাবি?

পারতপক্ষে মিথ্যে কথা বলে না পৃথা। সে এবার মায়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, ইউনিভারসিটি লাইব্রেরিতে একটা কাজ আছে। সাড়ে ছ'টা আন্দাজ ফিরবো।

আসলে লাইব্রেরিতে কোনো কাজ নেই পৃথার। সে কিছুক্ষণ বাড়ির বাইরে থেকে ঘুরে আসতে চায়।

বাড়ির কাছেই একটা টেলিফোন বুথ হয়েছে, পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় কথা বলা যায়। পৃথাদের বাড়িতেও ফোন আছে, কিন্তু সেটা এমনই খোলা জয়গায় যে, কোনো ব্যক্তিগত কথা বলার উপায় নেই। বাবা যখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ফোনে ব্যবসার কথা বলেন, বাড়ির সবাই তা শুনতে বাধ্য।

সম্বিতের অফিসে ফোন করা এক ঝামেলার ব্যাপার। অপারেটারের কাছে লাইন চাইলেই একটা মেয়ে যান্ত্রিক গলায় বলে, হোল্‌ড অন, প্লিজ! তারপর খানিকটা কমপিউটারের টুংটাং বাজনা শোনায়, একটু বাদে বলে, মিঃ রায় ওঁর ঘরে নেই। কোন ঘরে আছেন বলতে পারছি না!

সম্বিতের কাছে এই নিয়ে অনুযোগ করায় সম্বিৎ হাসতে হাসতে বলেছিল, কত লোক আমাকে ফোন করে, ঠিক পেয়ে যায়। খালি তুমিই পাও না? আমাদের অপারেটার তা হলে মেয়েদের গলা শুনলে দিতে চায় না। আমার মা-ও দু-তিনবার আমাকে পাননি।

পৃথা জিজ্ঞেস করেছিল, অপারেটারটির বয়েস কত?

সম্বিৎ বলেছিল, পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। দুর্দান্ত দেখতে, দারুণ পারফিউম ব্যবহার করে, অফিসে ওর নাম দেওয়া হয়েছে যোজনগন্ধা। কিন্তু ওর স্বামী বিরাট চাকরি করে, স্বামীর সঙ্গে খুব ভাব আছে, সুতরাং আমাদের নো চান্স। আমাদের সঙ্গে ভালো করে হেসে কথাও বলে না। তবু দ্যাখো, পৃথিবীর সব মেয়ের প্রতি ওর হিংসে!

আজ মেয়েটি হ্যালো বলতেই পৃথা দৃঢ় স্বরে জানালো, মিঃ সম্বিৎ রায়ের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, উনি আমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করছেন, নিশ্চয়ই ঘরে থাকবেন।

এবার সম্বিৎকে পাওয়া গেল। পৃথা বললো, তোমাদের অফিসে কি খুব কড়াকড়ি? এক ঘণ্টার জন্য বেরিয়ে আসতে পারবে না?

সম্বিৎ বললো, তুমি কি ভাবো আমি বেয়ারার কাজ করি? যখন ইচ্ছে বেরুতে পারি! তুমি কোথায় আসবে, কফি হাউসে?

পৃথা বললো, না।

সম্বিত বললো, তা হলে তুমি ভিকটোরিয়ার রেস্তোরাঁয় চলে এসো, আমি দরজার কাছেই একটা টেবিলে থাকবো। আমার পৌঁছাতে দশ মিনিট লাগবে।

পৃথা বললো, আমি থাকবো ইউনিভারসিটি লাইব্রেরিতে। সেখানে আসতে তোমার আপত্তি আছে?

সম্বিৎ বললো, আপত্তি নেই, কিন্তু লাইব্রেরিতে বসবো না।

পৃথাই পৌঁছে গেল আগে। একটা বই নিয়ে পড়লো দু'পাতা। তা হলে আর মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলা হলো না। সম্বিৎ এসে উঁকি দিতেই সে বেরিয়ে পড়লো।

পৃথার বন্ধু অতীন, দীপকরা বাড়িতে এলে কিংবা পৃথা ওদের সঙ্গে বেরুলে মা কোনো আপত্তি করেন না। কিন্তু সম্বিৎকে পছন্দ করেন না মা। তার কারণ মাত্র আঠাশ বছর বয়েসেই সম্বিৎ একবার বিয়ে করে ডিভোর্স করে ফেলেছে।

মায়ের এই মনোভাব দেখে পৃথার অবাক লাগে। সম্বিৎ তার বন্ধু। সে কি সম্বিৎকে বিয়ে করতে যাচ্ছে নাকি? খামখেয়ালি, বাউন্ডুলে ধরনের ছেলে সম্বিৎ, স্বামী হিসেবে নির্ভরযোগ্য নয় কিন্তু বন্ধু হিসেবে চমৎকার। ওর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সুন্দর সময় কাটে।

রাস্তায় এসে সম্বিৎ বললো, খিদে আছে, না শুধু তেষ্টা? যদি খিদে থাকে তা হলে একটা ভালো রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসবো। আর খিদে না থাকলে যে কোনো ছোটখাটো জায়গায় বসা যেতে পারে।

পৃথা বললো, খিদে নেই। কোনো ছোটখাটো জায়গাতেও বসবো না। আজ মেঘলা মেঘলা দিন আছে, কোনো পার্কে কিংবা ময়দানে গিয়ে বসলে হয় না?

সম্বিৎ বললো, বসবার মতন কোনো পার্ক কলকাতা শহরে নেই। ময়দানে কোথাও বসে ঘাসের ডগা ছিঁড়ে চিবুনো যেতে পারে বটে। তার মধ্যে দু'-এক প্যাকেট ধূপ কিনতে হবে, পোকায় ধরা চিনে বাদাম কিনতে হবে। তার চেয়ে চলো না, ট্রেনে করে কোথাও যাই?

পৃথা বললো, অতটা সময় আমার নেই। সামনেই আমার পরীক্ষা না? ভুলে যাচ্ছো?

—তা হলে কতটা সময় বরাদ্দ?

—ধরা যাক এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট।

—আর একটু বাড়াও। দেড় ঘণ্টা। রাজি?

—ঠিক আছে, দেড় ঘণ্টা। তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি, সম্বিৎ। আজ তোমাকে অফিস থেকে বার করে আনলাম খুব স্বার্থপর কারণে। সারাদিন ধরে পড়তে পড়তে একঘেয়ে লাগছিল। তাই ভাবলুম, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।

—সেটা আমার সৌভাগ্য। তুমি অন্য কারুকে না ডেকে আমার কথা ভেবেছো। আড্ডা মারার জন্য একটা নিরিবিলি জায়গা চাই। তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, আগে থেকে জানতে চাইবে না, আগে চলো, সেখানে তোমার ভালো লাগবে।

ফস করে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে ফেললো সম্বিৎ। সেটাতে উঠতে উঠতে পৃথা বললো, ভাড়াটা আমি দেবো।

সম্বিৎ বললো, তুমি চাকরি করো না। তোমার কাছ থেকে পয়সা নিতে আমার প্রেস্টিজে লাগবে। আমি আজকেই একটা টি এ বিল পেয়েছি, সঙ্গে অনেক ফালতু টাকা আছে। যাবার পথে গোটা কতক স্যান্ডুইচ আর পেস্ট্রি কিনে নিয়ে যাবো। যদি পরে খিদে পায়—

পৃথা বললো, আর একটা কন্ডিশান আছে। যতক্ষণ আমি থাকবো, সিগারেট খেতে পারবে না।

সম্বিৎ বললো, এটা মানা শক্ত। চেষ্টা করে দেখি।

ট্যাক্সি এসে থামলো রেসকোর্সের কাছাকাছি একটা বাড়িতে। নতুন চোদ্দতলা ফ্ল্যাট বাড়ি। লিফটে ওরা উঠে এলো চোদ্দতলায়। একটা ফ্ল্যাটের সামনে এসে বেল বাজাবার বদলে সম্বিৎ পকেট থেকে চাবি বার করলো।

পৃথা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটা কার ফ্ল্যাট?

সম্বিৎ বললো, আমারই ধরে নিতে পারো।

পৃথা বিশ্বাস করলো না। সম্বিৎদের বাড়ি জগুবাবুর বাজারের কাছে, সে একবার নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল। পুরোনো বাড়ি। একান্নবর্তী সংসার, সম্বিতের বরাদ্দে দেড়খানি ঘর। মাত্র তিন বছর আগে চাকরিতে ঢুকে এরকম জায়গায়, এত দামি ফ্ল্যাট কেনার সাধ্য সম্বিতের নেই।

ভেতরটা বেশ রুচিসম্মত ভাবে সাজানো। সম্বিৎ আর একটা দরজা খুলতেই দেখা গেল, সেখানে একটা বেশ চওড়া বারান্দা, সেখানেও বসবার জায়গা করা আছে। এই বারান্দা থেকে ময়দানের অনেকখানি, নতুন বিদ্যাসাগর সেতু ও গঙ্গা দেখা যায়।

সম্বিৎ বললো, দ্যাখো, এখানে বসলে প্রায় ময়দানেই বসা হলো। এরকম ভিউ তুমি আর কোথাও পাবে? পছন্দ হয়েছে?

পৃথা বললো, কার বাড়িতে আমাকে নিয়ে এলে ?

সম্বিৎ বললো, আমার এক বন্ধু, আর্মিতে কাজ করে। বিয়েতে যৌতুক পেয়েছে এটা। ওরা এখন আছে তেজপুর, আমাকে চাবি দিয়ে গেছে দেখাশুনো করবার জন্য। আমি ব্যবহারও করতে পারি। মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকি।

পৃথা একটু অনুমনস্ক হয়ে গেল। এরকম ফাঁকা ফ্ল্যাটে নিয়ে আসার একটাই মানে হয়। অন্য যে-কেউ শুনলে বা দেখতে পেলে তা-ই ভাববে। কিন্তু পৃথা ঘাবড়ালো না। তার নিজের ওপর বিশ্বাস আছে। সম্বিৎও জোরজার করার টাইপ নয়। অন্য কে কী ভাবলো, তাতে বয়েই গেল।

সম্বিৎ বললো, আমরা এখানেই বসবো ? ইচ্ছে করলে ভেতরেও বসতে পারি।

পৃথা একটা গদি আঁটা বেতের চেয়ারে বসে পড়ে বললো, এরকম একটা ফাঁকা ফ্ল্যাট দেখলেই আমার লোভ হয়।

লোভ শুনে সম্বিৎ একটু চমকে তাকালো।

পৃথা আবার বললো, তা হলে মন দিয়ে পড়াশুনো করতে পারতুম। আমাদের বাড়িতে যা গণ্ডগোল !

সম্বিৎ বললো, তুমি চলে আসতে পারো মাঝে মাঝে।

পৃথা বললো, কিন্তু তুমিও এখানে থাকলে পড়াশুনো হবে না।

সম্বিৎ বললো, তুমি এলে আমি কি আর অন্য জায়গায় বসে থাকতে পারবো ? তবে বেশি ডিসটার্ব করবো না।

পৃথা চুপ করে দৃশ্যটা উপভোগ করতে লাগলো। এত উঁচু বাড়িতে সে কখনো আসেনি, কলকাতার এমন দৃশ্যও সে দেখেনি আগে।

গল্প করার জন্য আসা কিন্তু গল্প জমছে না। সম্বিৎ মাঝে মাঝে এটা সেটা বলছে, পৃথা হুঁ-হাঁ দিয়ে যাচ্ছে শুধু।

এক সময় সম্বিৎ জিজ্ঞেস করলো, পরীক্ষা তো শিগগিরই শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারপর কী করবে, কিছু প্ল্যান করেছো ?

পৃথা মুখ ফিরিয়ে কয়েক পলক চেয়ে রইলো। তারপর বললো, মনে করো তোমার কোনো বন্ধু, সে মেয়ে নয় ছেলে, সে এম.এ. পরীক্ষা দেবার পর কী ধরনের প্ল্যান করে ?

সম্বিৎ বললো, যদি রেজাল্ট ভালো হয়, তা হলে পি. এইচ. ডি. করার কথা ভাবে। কিংবা চাকরি খোঁজে।

পৃথা বললো, আমিও অবিকল ঠিক ঐরকমই ভাবতে পারি না ? জানি,

আসলে তুমি কী জানতে চাও! আমি বিয়ের কথা ভাবছি কিংবা বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি কি না, এই তো? মেয়ে হলেই এই কথাটা মনে জাগে।

সম্বিৎ বললো, এরকম ভাবাটা কি অস্বাভাবিক কিছু?

পৃথা বললো, তুমি আমার বিয়ের ঘটকালি করতে চাও নাকি?

সম্বিৎ খানিকটা চঞ্চল হয়ে বললো, মোটেই না। এমনিই কৌতূহল। সত্যি কথা বলতে কি, আমি বিয়ে জিনিসটার বিরুদ্ধে। একবার ঠেকে শিখেছি। বিয়ে করলেই এমন সব ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে হয়, তখন ভালোবাসা-টালোবাসা সব উবে যায়!

পৃথা বললো, তোমার এই বন্ধুর ফ্ল্যাটটা তুমি যদি এক-দেড় বছর আগে পেতে, তা হলে তোমার বিয়েটা বোধহয় ভাঙতো না। পারমিতা তোমাদের ঐ একান্নবর্তী সংসারে অ্যাডজাস্ট করতে পারেনি।

—এ কথা পারমিতা তোমাকে বলেছে?

—সম্বিৎ, তোমার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা কখনো আলোচনা করবো না, এটাই ঠিক ছিল না? আমি মনে করি, ওটা তোমাদের এত ব্যক্তিগত ব্যাপার যে অন্যদের মাথা গলানো উচিত না।

—কথাটা তুমিই তুললে!

—ভুল করেছি, চেপে যাচ্ছি।

—বিয়ে না করলে যদি চলে, তাহলে প্রতিদিন এক বাড়িতে, এক বিছানায় দু'জনের কাটাবার দরকার কী? মেয়েরা চাকরি করে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। কোনো পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকতে পারে। মাঝে মাঝে দেখা হবে।

—শুনতে বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু মনে করো, সম্বিৎ, তুমি এই ফ্ল্যাটে একলা থাকো। একদিন তোমার হঠাৎ খুব ধুম জ্বর এলো। তখন কেউ পাশে বসলে ভালো লাগে না? কেউ একটু কপালে হাত বুলিয়ে দেবে—

—বান্ধবীকে খবর দেবো। আমি সেরকমভাবে ডাকলে তুমি আসবে না?

—আমার যদি অন্য কোনো বন্ধু থাকে? তার যদি হিংসে হয়?

—এ হিংসের ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না। ওটা মেয়েদেরই বেশি।

—বাজে কথা বলো না। পুরুষরা নিজের স্ত্রী কিংবা বান্ধবীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে। অন্য কেউ তার সঙ্গে হেসে কথা বললেও সহ্য করতে পারে না। এ নিয়ে কত খুনোখুনি পর্যন্ত হয়!

—বিয়ে করার পর জ্বর হলেও কি বউরা সব সময় কপালে হাত বুলিয়ে দেয়? তারা নিউ মার্কেটে বাজার করতে যায়। কিংবা টি ভি সিরিয়াল

দেখা শেষ না করে উঠে আসতে পারে না।

—তুমি পারমিতার নামে এরকম দোষ দিতে পারো না।

—মোটেই তার নামে দোষ দিইনি সাধারণভাবে বলছি। বিয়ের পর আমার একদিনও জ্বর-ফর হয়নি, সুতরাং ও প্রশ্নই ওঠে না। তুমিই কিন্তু আবার ঐ প্রসঙ্গটা টেনে আনছো!

তুমি আর বিয়ে করতে চাও না, বান্ধবী থাকবে, কিন্তু বান্ধবীর সঙ্গে এক জায়গাতেও থাকবে না।

—মাঝে মাঝে থাকতে পারি দু'-একদিন। মাঝে মাঝে থাকবো না। আমাদের সমাজ তো এখনো ঠিক পারমিট করে না। মোটকথা, দু'জনের দুটো আলাদা থাকার জায়গা চাই।

—এই ধরনের ফ্ল্যাট বাড়িতে আবার সমাজ কী? তুমি একটি মেয়ের সঙ্গে থাকলে কেউ কি জানতে চাইবে সে তোমার আইনসঙ্গত বউ কি না?

—কাজের লোকরা সে মেয়েটিকে বউদি বউদি বলে ডাকবে। সাধারণত এখানে কেউ কারুর সঙ্গে ভাব করে না, কিন্তু দু'-একজন গায়ে পড়া হয়। লিফ্‌টে দেখা হলে দেঁতো হাসি দিতে হয়। আমার প্রতিবেশী আমার বান্ধবীকে মিসেস দাশগুপ্ত বলে ধরেই নেবে। দু'জনের আলাদা পদবি শুনলে এখনো লোকে চোখ কপালে তোলে।

--আমি কারুর ওরকম বান্ধবী হতে চাই না।

—তবেই ত্যাখো, পৃথা, তোমার মধ্যে একটা খাঁটি ট্রাডিশনাল বাঙালি মেয়ে রয়ে গেছে! তুমিও বিয়ের কথাই ভাববে!

—ভাববো, সময় হলেই ভাববো। কটা বাজলো?

—এখনো এক ঘণ্টাও হয়নি। এত ছটফট করছো কেন?

—না, আমি ভাবছি, আমি স্বার্থপরের মতন তোমার অফিসের কাজ নষ্ট করে তোমাকে ডেকে এনেছি। তুমি ভদ্রতা করে আমার জন্য সময় দিচ্ছো।

—মোটেই তা নয়। তোমার সঙ্গে কথা বলতে, সময় কাটাতে আমার ভালো লাগে। আমি তো আর কিছু চাই না! পৃথা, তুমি কি জানো, তুমি খুব ইন্টারেস্টিং মেয়ে?

হঠাৎ পৃথা অন্যমনস্ক হয়ে মুখ ফেরালো পাশের দিকে। সেদিকে চোখে পড়ে বিস্তৃত ময়দান, মেঘলা আকাশের ছায়া পড়েছে সেখানে। ঘাসের ওপর শুয়ে আছে কিছু মানুষ, তবু পৃথা যেন দেখতে পেল একটা অন্ধকার ঘর, শুধু লাল রঙের একটা মৃদু বাতি জ্বলছে, পৃথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে

একজন বলিষ্ঠকায় পুরুষ, তার নিঃশ্বাস যেন লাগছে পৃথার গায়ে।

পৃথা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ভালো করে ফ্ল্যাটটা একবার ঘুরে দেখবো?

সম্বিৎ বললো, হ্যাঁ, সব ঘরই খোলা।

পৃথা শয়নকক্ষদুটিতে শুধু উঁকি মারলো, ভেতরে ঢুকলো না। বিছানা দেখলে মনে হয়, অনেকদিন কেউ শোয়নি। সবচেয়ে ভালো লাগলো তার বাথরুমটা দেখে। কত বড় আর নীল রঙের টালি বসানো, তাতে উড়ন্ত হাঁস আঁকা। শাওয়ার, বাথটাব। বেসিনটা একেবারে ঝকঝক করছে, সোনালি রঙের কলগুলো যেন খাঁটি সোনার। তুলনায় পৃথাদের বাড়ির বাথরুম কত ছোট আর ময়লা ময়লা। আঃ এই রকম বাথরুমে স্নান করে আরাম।

কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সম্বিৎ। সে জিজ্ঞেস করলো, কী, পছন্দ হয়?

পৃথা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, আমার স্নান করে নিতে ইচ্ছে করছে। তোয়ালে আছে?

সম্বিৎ বললো, হ্যাঁ। নাও না স্নান করে।

পৃথা বললো, না থাক। একি, তুমি বারবার পকেটে হাত দিচ্ছো আর বার করছো কেন?

সম্বিৎ এবার অপরাধীর মতন হাসলো। তারপর বললো, অভ্যেস! তুমি সিগারেট খেতে বারণ করেছো। এতক্ষণ না খেয়ে তো থাকি না।

পৃথা বললো, ঠিক আছে, একটা খেতে পারো!

সম্বিৎ বললো, নাঃ! সংযম দেখাচ্ছি, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত পাশ করি কি না!

বাথরুম থেকে বেরিয়ে হলঘরটায় এসে সম্বিৎ বললো, এবার কি খিদে পেয়েছে? সঙ্গে খাবার আছে।

পৃথা বললো, এখানে চা বানানো যায় না?

সম্বিৎ বললো, চা-চিনি আছে জানি, বোধহয় দুধ নেই। দেখি—

হঠাৎ এই সময় কলিংবেল বেজে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে গেল দু'জনের মুখ। পরস্পরের দিকে তাকালো বিহ্বল ভাবে।

আবার বেল বাজলো, বেশ কয়েকবার।

পৃথা ফিসফিস করে বললো, তোমার বন্ধু ফিরে এসেছে?

সম্বিৎ বললো, না, সে হঠাৎ ফিরবে কী করে? তা ছাড়া ওর কাছে তো চাবি আছে আর একটা। ও বেল বাজাবে কেন? পৃথা বললো, তা

হলে—

সম্বিৎ বললো, চুপ করে থাকো। যে-ই বাজাক, খোলা হবে না। এ ফ্ল্যাটে কেউ থাকে না। ফিরে যাবে।

পৃথা বললো, লিফ্‌টম্যান আমাদের দেখেছে।

সম্বিৎ বললো, দেখুক গে!

পৃথা ভয় পেয়ে সম্বিতের কাঁধ ধরে দাঁড়ালো। যদি লিফ্‌টম্যানের কাছে শুনে থাকে যে ভেতরে লোক আছে, তা হলে বেল তো বেজেই চলবে। না খুলে পারা যাবে? যত দেরি হবে....

এই সময় অসম্ভব সব চিন্তা মাথায় আসে। পৃথার ছোট কাকার সঙ্গে সম্বিতের সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছিল, তিনি সম্বিৎকে পছন্দ করেন না। তিনি কোনোভাবে খবর পেয়ে চলে এসেছেন? এই ভাবে বন্ধ ফ্ল্যাটে দু'জনকে দেখলে...। কিংবা পারমিতা? কিংবা সম্বিতের বাবা?

সম্বিৎ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে পৃথাকে নিঃশব্দ থাকার ইঙ্গিত করে পা থেকে জুতো খুলে ফেললো। তারপর পা টিপে টিপে এগুলো দরজার দিকে। ম্যাজিক আই দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়।

পৃথা আরও ভয় পেয়ে দৌড়ে ঢুকে পড়লো একটা বেডরুমে।

সে শুনতে পেল, সম্বিৎ দরজা খুলেছে। কথা বলছে কার সঙ্গে। একটু বাদে আবার দরজা বন্ধ হবার শব্দ। কেউ ঢুকে এসেছে সম্বিতের সঙ্গে? বুক ঢিপ ঢিপ করছে পৃথার।

সম্বিৎ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কই, কোথায় গেলে?

পৃথা কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

সম্বিৎ খুঁজতে খুঁজতে এ ঘরে এসে দেখলো, পৃথা একটা আলমারির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে।

তার হাত ধরে টেনে সম্বিৎ বললো, পোস্টম্যান। একটা রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে গেল আমার বন্ধুর নামে। তুমি এত ভয় পেয়ে গেলে?

সত্যিই তো, পৃথা সম্বিৎকে ভয় পায়নি, অথচ ভয় বাইরের লোকদের। সে এবারে অবসন্নভাবে সম্বিতের বুকে মাথা রেখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো।

সম্বিৎ তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, এত ভয়ের কী আছে?

পৃথা বললো, যদি সত্যিই কেউ এসে পড়তো, আমাদের চেনা কেউ, কিংবা তোমার ঐ বন্ধু?

সম্বিৎ বললো, তা হলে কী আর হতো? বলতুম যে তুমি আমার বান্ধবী!

বান্ধবী দু'রকম হয়। একজনের সঙ্গে শুধু কথা বলা, গল্প হাসি ঠাট্টা। আর একরকম বান্ধবীর সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক থাকে, প্রেমিকাও বলা যায়। পৃথা সম্বিতের সঙ্গে প্রথম রকমের সম্পর্ক রেখেছিল, সেজন্য সে সম্বিতের সঙ্গে ফাঁকা ফ্ল্যাটে আসতেও দ্বিধা করেনি। অথচ, মাত্র কয়েকবার কলিং বেলের শব্দেই সে এখন প্রেমিকার মতন সম্বিতের বুকে মাথা রেখেছে!

নিজেকে সরিয়ে নিতে গিয়েও পারছে না সে।

সম্বিৎ তার থুতনিটা ধরে মুখখানা উঁচু করলো। তারপর বললো, পারমিতার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ির আসল কারণটা কী জানো? শুধু তোমাকেই বলছি। অনেকে আমাকেই দোষ দেয়। কিন্তু আসল কারণটা আমি মুখ ফুটে বলতে পারি না। তাতে পারমিতারই ক্ষতি হবে এই জন্য! পারমিতা ওর এক মাসতুতো দাদাকে খুব ভালোবাসে।

পৃথা আস্তে আস্তে বললো, শুভব্রত?

সম্বিৎ বললো, হ্যাঁ, তুমি চেনো! ছেলেমানুষী ব্যাপার। মাসতুতো দাদাকে ভালোবাসে তো কী হয়েছে? আগে যাই ঘটে থাকুক, বিয়ের পর ওর সঙ্গে যদি দাদার মতন স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখে, তাতে তো দোষের কিছু নেই। আমি ওকে অনেকবার বলেছি, আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবো না। কিন্তু পারমিতা অপরাধবোধে ভোগে। গোপনে ওর সঙ্গে দেখা করতো। একবার আমার চোখে পড়ে গিয়েছিল, আমি না-দেখার ভান করেছি। মুশকিল হলো এই যে, ঐ শুভব্রতর আবার আমার ওপর একটা রাগ রাগ ভাব। যেন আমিই ওর বোনকে কেড়ে নিয়েছি। এদিকে মাসতুতো বোনকে বিয়ে করার সৎসাহসও নেই। ঐ শুভব্রতই জট পাকিয়ে তুললো।

পৃথা বললো, আমরা জানতাম, পারমিতার সঙ্গে শুভব্রতর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল এক সময়। ভেবেছিলাম, বিয়ের পর সেটা কাটিয়ে উঠবে। নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছে যখন।

সম্বিৎ বললো, বিয়ের আগে, বাচ্চা বয়েসে অনেক মেয়েরই ঐরকম একটু আধটু ইনসেসচুয়াস[২] ব্যাপার-স্যাপার থাকে। আমিও আমার এক পিসতুতো দিদিকে খুব অ্যাডমায়ার করতাম এক সময়। ও নিয়ে পরে মাথা ঘামাবার কোনো মানে হয় না। আর একটা ব্যাপার জানো তো, পৃথা, পারমিতা তোমাকে মোটেই পছন্দ করতো না।

—জানি।

—তোমার নাম শুনলেই জ্বলে উঠতো। আমি মাঝে মাঝে তোমার প্রশংসা করতাম।

—কেন করতে ?

—তুমি প্রশংসার যোগ্য বলে। তুমি কারুর নিন্দে করো না। তোমার অনেক গুণ। আমার মুখে তোমার নাম শুনলেই পারমিতা বলতো, তুমি আমার চেয়ে পৃথাকে বেশি ভালোবাসো !

পৃথা এবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললো, অ্যাই, অ্যাই সম্বিৎ ! আমি তোমার বিয়ে ভাঙার জন্য কোনোক্রমেই দায়ী নই। তোমাদের বিয়ের পর আমি তোমাদের এড়িয়ে গেছি। তোমার সঙ্গে আমার সেরকম কোনোই সম্পর্ক ছিল না। পারমিতা আমাকে পছন্দ করতো না, তার কারণ কলেজের স্পোর্টসে আমি প্রাইজ পেতাম অনেকগুলো, ও পারতো না। তবে সুন্দরী বলে ওর বেশ গর্ব ছিল !

সম্বিৎ বললো, পারমিতার চেয়ে তুমি অনেক বেশি সুন্দর। বিশেষ করে তোমার চোখ দুটো।

ফিক করে হেসে ফেলে পৃথা বললো, এবার বুঝি আমাকে সিডিউস[য়] করার চেষ্টা করছো ? ওতে কিছু সুবিধে হবে না, চাঁদু !

—আমি কোনো সুবিধের কথা ভেবে তো বলিনি। তোমাকে আমার বরাবরই সুন্দর লাগে !

—খুব হয়েছে। আমি এবার যাবো। সন্ধেবেলা আমার কোচিং ক্লাস আছে।

—এই, খাবারগুলো খেয়ে নাও। আমি চা বানাচ্ছি।

—নাঃ, কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি খাও। আমি চললুম !

—ওকি, চললে মানে কী ? আমিও তো যাবো তোমার সঙ্গে। দাঁড়াও, বারান্দার দরজাটা বন্ধ করি।

—না, তুমি একটু পরে বেরিও। আমি একা যাই। তোমার সঙ্গে এক সঙ্গে বেরুতে গেলে যদি কেউ দেখে ফেলে, আমি সেটা চাই না। কেন মিছিমিছি পরনিন্দার খোরাক হবো !

—কেউ দেখবে না। এখানে কে চিনবে তোমাকে ?

—বলছি যে আমি একলা যাবো !

সম্বিৎ থমকে গিয়ে বললো, ওরে বাবা, রীতিমতন ধমক লাগাচ্ছো যে ! ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। শুধু একটা অনুরোধ করবো ? তোমার

সঙ্গে সময় কাটিয়ে আমার খুবই ভালো লেগেছে। কিন্তু—

—আমারও খুব ভালো লাগলো। এমন একটা চমৎকার জায়গা দেখালে।

—কিন্তু, পৃথা, এতক্ষণে আমি অন্তত তিনটে সিগারেট খেতাম। তোমার কথা শুনে খাইনি এই যে সংযম দেখালাম, তার জন্য কিছু পুরস্কার পাবো না?

—খুব ভালো কাজ করেছো। আর সিগারেট খেও না। লক্ষ্মী ছেলে!

—শুধু ওতে হবে না। আরও অনেক সংযম দেখিয়েছি। সে জন্য কি দু'-একটা চুমু পেতে পারি না?

হাসিমুখে সম্বিতের দিতে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে, তারপর মাথা দোলাতে দোলাতে পৃথা বললো, না, ওসব হবে না! আমি তো তোমার সেরকম বান্ধবী নই!

সম্বিৎ বললো, সেরকম আর এরকম কী! আমাকে বুঝি তুমি পুরুষ হিসেবে গণ্য করো না?

পৃথা বললো, তুমি চমৎকার পুরুষ। কিন্তু আমি যখন তখন শারীরিক ব্যাপারে বিশ্বাসী নই।

পৃথা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সম্বিৎ তার পেছন পেছন এসে বললো, অন্তত একটা চুমু? খুব ইচ্ছে করছে। এতে কী এমন দোষ আছে?

পৃথা বললো, না, একটাও নয়!

সম্বিৎ বললো, আধখানা! শুধু ঠোঁটে একটু ঠোঁট ছোঁয়াবো? একটু অমৃতের স্বাদ নেবো।

পৃথা বললো, ওসব অমৃত টমৃত বাজে কথা। আধখানা নয়, সিকিও নয়।

তারপর দরজার হাতলে হাত দিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে পৃথা বললো, আচ্ছা, একটা চুমু খেয়ে দেখা যাক।

নিজেই সে দু'হাত রাখলো সম্বিতের কাঁধে। সম্বিৎ তার পিঠে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো।

কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ানো মাত্র ছিটকে সরে গেল পৃথা। এ তার কী হলো? সে যেন চকিতে আবার দেখতে পেল একটা অন্ধকার ঘর, সেখানে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সম্বিৎ নয়, একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ, তার নিশ্বাসের আঁচ লাগছে পৃথার গায়ে।

॥ ৩ ॥

আজ আরতির পাঠশালায় সাতজন ছাত্রী। বুধবার সন্ধেবেলা এদের জন্য আরতির বরাদ্দ দেড় ঘণ্টা। এর মধ্যে চলে এলো পৃথা। অন্য মেয়েরা পার্ট টু পরীক্ষা দেবে, পৃথার থেকে জুনিয়ার।

আরতি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী রে, তুই হঠাৎ আজ এলি ? পরশু থেকে তোর পরীক্ষা আরম্ভ ?

পৃথার উপস্থিতিতে সব সময়েই একটা ঝলমলে ভাব থাকে। আজ তার মুখটা শুকনো। একটা সাধারণ ডুরে শাড়ি ঘরোয়াভাবে পরে এসেছে, একটুও প্রসাধন করেনি, ভালো করে চুল আঁচড়ায়নি পর্যন্ত। পৃথার বয়েসী মেয়েরা এমনভাবে বাড়ি থেকে বেরোয় না।

পৃথা বললো, তোমার কাছ থেকে কয়েকটা ব্যাপার একটু ঝালিয়ে নেবো। কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না।

আরতি বললো, এখানে বসলে তোর সময় নষ্ট হবে। তুই বরং আমার লাইব্রেরি ঘরে চলে যা, ওখানে চেয়ারটেবিল আছে। তোর প্রবলেমগুলো নোট ডাউন কর, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে এদের ছেড়ে দিয়ে আসছি।

একথা বলার পরেও আরতি চেয়ার ছেড়ে উঠে এলো। পৃথাকে বইয়ের ঘরটার দিকে নিয়ে যেতে যেতে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, কী রে, নার্ভাস লাগছে নাকি ? ওরকম হয়, পরীক্ষার ঠিক আগে ভালো ছাত্রীদেরও হঠাৎ কেমন মনের জোর চলে যায়। আমারও মনে আছে, ফাইনালের দু'দিন আগে হঠাৎ মনে হলো কিছুতেই ফার্স্ট ক্লাস পাবো না, ড্রপ করবো। বাবা ধমকে-ধামকে জোর করে পাঠালেন, তখন আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সেবার ড্রপ করলে আর হয়তো পরীক্ষা দেওয়াই হতো না।

পৃথা বললো, আরতি মাসি, আমি যেন সব ভুলে যাচ্ছি !

আরতি বললো, আহা, ভুললেই হলো ! খাতা নিয়ে বসবার পর দেখবি আবার সব মনে পড়ে যাচ্ছে। অঙ্কে তো আর মুখস্থ বিদ্যে খাটে না যে সব ভুলে যাবি ! আজ আর বেশি পড়াশুনো করার দরকার নেই। পরীক্ষার আগে রিলাক্সড্ থাকতে হয়। তুই বোস, আমি এসে গল্প করবো।

আরতির খুব বইয়ের শখ। যেটা তার মেয়ের ঘর ছিল,.সেটাতে প্রচুর বইপত্র সাজিয়েছে। অনেক দামি দামি পেইন্টিং-এর বই আছে। জানলার ধারে একটা টেবিল ও চেয়ার, আরতি কিছু একটা বইও লেখার চেষ্টা করছে কয়েক মাস ধরে। টেবিলের পাশে স্তূপাকার বিদেশি সায়েন্স জার্নাল।

এই ঘরে আগে এসেছে পৃথা, তবু আজ ঘুরে ঘুরে বইয়ের সংগ্রহ

দেখতে লাগলো। আরতির ছেলে ও মেয়ের দু'খানা বাঁধানো ফটোগ্রাফ ঝুলছে দেয়ালে। আর এক দেয়ালে একটা বরফ মাখা পাহাড়ের ছবি, খুব সম্ভবত কাঞ্চনজঙ্ঘার। সে ছবিখানা অসাধারণ। এসব ছবি নিশ্চয়ই রজতের তোলা।

আরতি ঠিকই ধরেছে, পৃথার পরীক্ষা দিতে ইচ্ছে করছে না এবার। যদিও সে জানে, তা হলে মহা গোলমাল হবে বাড়িতে। এখন তাদের টানাটানির সংসার, এর মধ্যে আরও এক বছর সে বেকার ছাত্রী হয়ে থাকলে দৃষ্টিকটু তো দেখাবেই। পৃথা ঠিক করেই রেখেছিল, এই পরীক্ষাটা দিয়েই সে স্বাধীন হয়ে যাবে। স্কলারশিপ পেলে তবেই রিসার্চ করবে, না হলে চাকরি। স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে তার একটা চাকরি পাবার সম্ভাবনা অনেকটাই ঠিক।

কিন্তু এবার পরীক্ষা দিলে, ভালো রেজাল্ট দূরে থাক, সে যদি পাশ করতে না পারে? ছি ছি ছি, লজ্জায় সে লোককে মুখ দেখাবে কী করে? অথচ, মাঝে মাঝে তার মাথাটা একেবারে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, সত্যিই কিছু মনে পড়ছে না। কেউ এটা বিশ্বাস করবে না।

পৃথা কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

এই ঘরের পাশের ঘরটাই রজতের ফটোগ্রাফির ডার্করুম। কেন যে সেই ঘরটায় ঢুকতে গিয়েছিল পৃথা!

অথচ ব্যাপারটা তো অতি সাধারণ। এই ফ্ল্যাটে তখন রজত ছাড়া আর কেউ ছিল না। রজত অসাধারণ ভদ্র ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে। সামান্যতম অশোভন ইঙ্গিত দেয়নি। এমনকি অন্ধকার ঘরটায় পৃথা যখন ছবির নেগেটিভ পজিটিভ হওয়া দেখছিল, তখন রজত তার পাশে দাঁড়ালেও একবারও চেষ্টা করেনি তার শরীর ছোঁওয়ার। এমনকি ইয়ার্কির ছলেও পৃথাকে জড়িয়ে ধরেনি, যা অধিকাংশ পুরুষই করে, এবং যা তেমন দোষের বলে গণ্যও হয় না। একজন খাঁটি ভদ্রলোকের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কী আর আশা করা যায়?

তবু কেন ঐ অন্ধকার ঘরটা পৃথার মাথায় গেঁথে গেল? কেন সে তার শরীরে রজতের উষ্ণ নিঃশ্বাসের আঁচ পায়?

ঐ ঘরটায় আর একবার ঢুকলে কি এটা কেটে যেতে পারে? কিন্তু এমনি এমনি পৃথা হঠাৎ ও ঘরে ঢুকবে কী করে? আরতি মাসি কী ভাববেন! নাঃ এটা মোটেই সম্ভব নয়।

ঠিক এর পরের মুহূর্তেই পৃথা চোরের মতন পা টিপে টিপে লাইব্রেরি

ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে, দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে পাশের ঘরের দরজাটা ঠেললো। খুলছে না। তালা দেওয়া নাকি? নাঃ, ওপরের দিকে একটা ছোট্ট ছিটকিনি আটকানো।

সেটা খুলতেই টক করে একটা শব্দ হলো।

আরতি হল ঘরটার অন্যদিকে এদিকে পেছন ফিরে বসে আছে। পড়াচ্ছে মনোযোগ দিয়ে, শব্দ শুনতে পায়নি। ছাত্রীদের মধ্যে একজন দেখতে পেয়েছে পৃথাকে, এদিকে চেয়ে আছে। দেখুক না। পৃথা এ বাড়ির যে-কোনো ঘরে ঢুকতে পারে। সে তো অন্য ছাত্রীদের মতন নয়।

এ ঘরটাকে এখন ডার্করুম বলা যায় না। দুটো জানলা খোলা। পর্দা সরানো, রাস্তার আলো এসে পড়েছে। অন্য সময় জানলা টানলা সব বন্ধ করে, কালো পর্দা টেনে নিশ্ছিদ্র করা হয়।

আগের দিনের সঙ্গে ঘরটার কেমন মিল নেই। আগের দিন ঘরের মাঝখানে একটা দড়ি টাঙানো ছিল, তাতে ঝুলছিল অনেক নেগেটিভ। একটা বড় ট্রে-তে ঢালা ছিল অ্যাসিড, আরও কী সব ছিল যেন। অন্যরকম চেহারা ছিল, অন্যরকম গন্ধ ছিল, গেঞ্জি পরা একজন সবল পুরুষমানুষ ছিল।

টেবিল ল্যাম্পটার সুইচ টিপেও অবাক হলো পৃথা। আগের দিন জ্বলছিল একটা লাল রঙের বাল্‌ব, আজ স্বাভাবিক আলো। ইচ্ছে মতন বাল্‌ব বদলানো হয়।

টেবিলের ওপর ছড়ানো টুকরো টাকরা আর্ট পেপার, কয়েকটা বাতিল ছবি, কিছু কিছু রং-তুলি। দেয়ালের একটা র‍্যাকে ছোট ছোট কার্ড বোর্ডের বাক্সে ভরা নেগেটিভ। দু'-একটা বাক্স খুলে দেখলো পৃথা। নেগেটিভ দেখে ছবির মজা পাওয়া যায় না।

টেবিলে চার-পাঁচটা দেরাজ। তার একটা খুলতেই চোখে পড়লো গোছা গোছা এনলার্জড প্রিন্ট। তার একটা গোছা বার করে নিল পৃথা। আরতি মাসি এসে পড়লেই বা কী! পড়ায় তার মন বসছে না, সে কিছুক্ষণ ছবি দেখতে পারে না! ছবি তো দেখারই জন্য।

সত্যি বেশ ভালো ছবি তোলে রজত। প্রথম দিকে অনেকগুলো প্রাকৃতিক দৃশ্য। মনে হয় সাঁওতাল পরগনার কোনো ছোট শহর। দিগন্তরেখায় পাহাড়ের সারি। শাল-মহুয়ার জঙ্গল। শুকনো নদীর খাতে ছুটছে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে।

অন্যমনস্কভাবে ছবিগুলো দেখে যাচ্ছে পৃথা। হঠাৎ একটা ছবির গোছা নিয়ে সে চমকে উঠলো। হঠাৎ যেন ঝাঁকুনি লাগলো তার সারা শরীরে।

ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো কান দুটো। একটি সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়ের সম্মুখ ছবি। মুখটা একটু পাশ ফেরানো, চুলগুলো এমনভাবে এসে পড়েছে যে চেনা যায় না।

আকাঁ ছবিতে, ফটোগ্রাফিতে নগ্ন নারীশরীরের ব্যবহার তো অহরহ, পৃথা কি তা জানে না ? কিন্তু একজন চেনা মানুষ সেইরকম একজন শিল্পী, এটা ভাবলেই যেন কেমন লাগে। এই মেয়েটা যখন এমনভাবে সব পোশাক খুলে দাঁড়িয়েছিল, তখন সেখানে ছিল রজত, সে ঠিক মতন লাইটিং করেছে, হয়তো মেয়েটার হাত কিংবা কাঁধ ধরে পোজ ঠিক করে দিয়েছে। আরতির স্বামী যে রজতকে সে চেনে, অত্যন্ত ভদ্র আর নম্র, তাকে কোনো নগ্ন মেয়ের সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় যেন কল্পনাও করা যায় না।

এটা কি আরতির ছবি ? স্বামীরা তো স্ত্রীদের সবরকম অবস্থাতেই দেখে, ছবিও তুলতে পারে। কিন্তু এই ছবির মেয়েটির বয়েস মোটেই বেশি নয়। এর বুক, এর কোমরের খাঁজ যে রকম, তাতে তেইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়েস মনে হয়। কোনো আদিবাসী মেয়েও নয়।

পরপর কয়েকখানি সেই একই নগ্ন শরীর, নানা ভঙ্গিমার, মুখ ফেরানো। সবগুলিই দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়। ঘরের মধ্যে না ফাঁকা জায়গায় তা বোঝার উপায় নেই। শুধু মেয়েটির ছবি ছাড়া পটভূমিকা শূন্য।

একটা ছবি দেখে পৃথা আবার চমকে উঠলো। এবারে একেবারে ক্যামেরার দিকে ফেরানো মুখ। চিনতে একটুও অসুবিধে হবার কথা নয়। যদিও এ মেয়েটিকে পৃথা কখনো দেখেনি। তবু সে ঠিকই ধরেছিল, চব্বিশ-পঁচিশ বছরেরই একটি তরুণী। এবং এই ছবিটি রীতিমতন অশ্লীল ! নগ্ন ছবি হলেই যে তা অশ্লীল হবে তার কোনো মানে নেই, তা শিল্প হতে পারে। কিন্তু এই ছবিটিতে মেয়েটা হাসছে ! ফটোগ্রাফারের সামনে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে হাসবে কেন ? তার স্তন, উরু, সব কিছু দেখা যাচ্ছে, তার হাসিতে লোভের ইঙ্গিত। এরকমভাবে বাজে মেয়েরা হাসে। বাজে পত্রিকায় এই ধরনের ছবি ছাপা হয়। কিন্তু রজত তো পেশাদার ফটোগ্রাফার নয়। সে ছবি বিক্রি করে না। তবু সে এরকম ছবি তুললো কেন ?

আরতি মাসি এই ছবিগুলোর কথা জানে ?

এ বাড়িতে এসে পৃথার মনে হয়, স্বামী-স্ত্রী দু'জনে দু'জনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কারুর বাধার সৃষ্টি করে না। আরতির ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় রাত ন'টা পর্যন্ত থাকে বলে রজত অফিস থেকে প্রায়ই তার পরে ফেরে।

এই মেয়েটাই বা কে ? প্রফেশনাল মডেলদের কথা জানে পৃথা, কিন্তু

রজত শুধু শুধু সেরকম একটা মেয়ে ভাড়া করতে যাবে কেন? এই ছবিগুলোতে কী শিল্প আছে?

এই সময় আরতি মাসি এসে পড়লে সত্যি লজ্জার ব্যাপার হবে। ছবিগুলো তাড়াতাড়ি আবার ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিল পৃথা। বেরিয়ে এলো সে ঘর থেকে। এবারেও আরতি তাকে লক্ষ্য করেনি। পৃথার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। মাত্র দশ-পনেরো মিনিট সময় গেছে, এর মধ্যেই সে কী একটা ব্যাপার জেনে ফেললো! রজত মানুষটা এরকম? শুধু ঐ একটা মেয়ের ছবি তুলেছে, না আরও অনেক মেয়ের?

টেবিলে বলে পড়াশুনো শুরু করার বদলে সে একটা ছবির বই টেনে নিল। একজন ইতালিয়ান শিল্পীর ছবি। এর মধ্যেও পাতার পর পাতা নগ্ন নারী, কখনো একজন, কখনো দু'জন-তিনজন। এগুলো তো সাধারণ ফটোগ্রাফ নয়, এগুলো শিল্প। এই সব নারীদেরও মন থেকে আঁকা হয়নি, সামনে মডেল দাঁড় করানো হয়েছে। ওদেশে এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

কার পায়ের শব্দ পেয়ে পৃথা তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করে দিল! তারপর নিজেই সে বকুনি দিল নিজেকে। এরকম নার্ভাস হবার কারণ কী? সে বাচ্চা মেয়ে নয়, সে নগ্ন মেয়েদের পেইন্টিং দেখতে পারে না? আরতি মাসিও যথেষ্ট শিক্ষিত, তিনি এই সব বই রেখেছেন, নিজে দেখেন. অন্য অনেকে দেখবে বলেই তো!

চায়ের ট্রে নিয়ে এসেছে ওদের বাড়ির কাজের মেয়েটি।

টেবিলের ওপর রেখে সে বললো, দিদিমণি বললেন, তুমি একা বসে আছো, চা খাও! উনি আসছেন।

ট্রে-র দিকে তাকিয়ে পৃথা জিজ্ঞেস করলো তিনটে কাপ কেন?

কাজের মেয়েটি বললো, দাদাবাবুও এ ঘরে বসে চা খাবেন।

—দাদাবাবু, মানে রজতদা অফিস থেকে ফিরেছেন?

—দাদাবাবু তো আজ কাজে যাননি। এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন।

—কাজে যাননি?

পৃথার আবার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। সর্বনাশ! রজতদা বাড়িতেই ছিলেন? পৃথা যখন চোরের মতন ডার্করুমে ঢুকে ঐসব ছবি দেখছিল, তখন যদি রজতদা ঢুকে পড়তেন?

আজ এখানে পৃথার না আসাই উচিত ছিল। ডার্করুমে ঢুকে ঐসব না দেখাই উচিত ছিল!

চটি ফটফটিয়ে দরজার কাছে এসে রজত থমকে দাঁড়ালো। ইতস্তত

করে বললো, আরে কে ওখানে ? পিউ নাকি ? কখন এলে, পিউ ?

পৃথার সারা মুখ লজ্জায় রাঙা। রজতের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছে না। কোনোক্রমে বললো, এই একটু আগে !

পাজামা আর সাদা পাঞ্জাবি পরে আছে রজত। বোতাম নেই, বুক খোলা। চোখে একটু একটু ঘুম। মাথার চুল এলোমেলো। বয়েসের ছাপ পড়েনি শরীরে। রজত নিশ্চয়ই এক সময় খেলাধুলো করতো।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললো, উঃ কী ঘুমিয়েছি ! কখন সন্ধে হয়ে গেছে, আমাকে ডাকেনি। অফিসের কাজে দুর্গাপুর গিয়েছিলুম, বুঝলে, গাড়ি করে ফিরছিলাম, রাস্তায় গাড়িটা গোলমাল করতে লাগলো, বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত তিনটে। আজ আর অফিসে যাইনি, কই চা ঢাললে না ?

পৃথা টি পটের ঢাকনা তুলতে গিয়ে সেটা ফেলে দিল মাটিতে। তার হাত কাঁপছে।

সেটা ভাঙলো না অবশ্য। রজত ঝট করে হাত বাড়িয়ে সেটা লুফে নিয়ে হেসে বললো, দেখলে, এখনো কী রকম ক্যাচ ধরতে পারি ! আমাকে চিনি দিও না, পিউ। একটুও না।

পৃথা কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছে না। রজতদা তাকে পিউ বলে ডাকে কেন ? আরতি মাসিও তার ডাক নাম জানে, তবু তাকে পৃথাই বলে। বাড়ির কেউ তাকে পিউ বলে ডাকে না।

রজত বললো, তোমার পরীক্ষা তো এসে গেল ? পর্শু না ? নার্ভাস লাগছে ? তুমি তো খুব ভালো ছাত্রী শুনেছি। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়া চাই কিন্তু ! তোমাকে নিয়ে আরতির খুব গর্ব আছে।

সুন্দর কথাবার্তা। ভদ্র, সভ্য মানুষ। কিন্তু ডার্করুমে ঐ ছবিগুলো যিনি তুলেছেন, তার সঙ্গে এই মানুষটিকে যেন মেলানো যায় না। ওঁদের নিখুঁত বিবাহিত জীবন, কখনো কোনো গোলমালের কথা শোনা যায়নি। কিন্তু নিজের স্বামী অন্য একটি ন্যাংটো মেয়ের ছবি তুলেছে, এটা আরতি মাসি মেনে নেবে ? আরতি মাসি জানে না ব্যাপারটা ? ছবিগুলো খুব গোপন করেও তো রাখা হয়নি, ড্রয়ার খুললেই দেখা যায়। আরতি মাসি ওঘরে কখনো যায় না ?

চায়ে চুমুক দিতে দিতে রজত বললো, আরতির চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। পড়ানোটা আরতির নেশার মতন। কিছুতেই উঠতে পারে না।

পৃথা বললো, ওকে ডাকবো ?

রজত বললো, ডাকলেও বলবে, আসছি, আসছি! প্রত্যেকদিন ওর জন্য চা-টা আবার গরম করতে হয়। আমি কী নিয়ম করেছি, জানো? আরতিকে বলেছি, যতই তুমি ছাত্র-ছাত্রী পড়াও, বিকেলবেলা চা-টা আমার সঙ্গে বসে খেতে হবে। আমার একা একা চা খেতে ভালো লাগে না। আজ অবশ্য তুমি আছো।

পুরুষের দৃষ্টি বিভিন্ন রকম হয়। পৃথা বুঝতে পারছে, রজতের চাউনিতে কোনো লোভ নেই, সে তার শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের ওপর চোখ বোলাচ্ছে না। এই মানুষই একটি নগ্ন নারীশরীরের সব জায়গায় আলো ফেলে ছবি তুলেছে!

রজত আবার বললো, পিউ, তোমাকে একটা কথা বলবো? ক'দিন ধরেই আরতিকে এই প্রস্তাবটা দেবার কথা ভাবছিলাম। ওর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যে-রকম বাড়ছে, এবার ওর একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। তোমার পরীক্ষা হয়ে যাবার পর তুমি আরতিকে সেই সাহায্যটা করো না?

পৃথা বললো, আমি পড়াবো? আমি কখনো পড়াইনি।

রজত বললো, আরতিও তো আগে কখনো পড়ায়নি। দু'দিনেই শিখে নেবে। পরীক্ষা হলেই তো তুমি কেটে পড়বে। তোমার আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। এতে রাজি হলে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

পৃথার বুকটা আবার কেঁপে উঠলো। এ কথার মানে কী? রজতদা তো তার সঙ্গে দেখা করার জন্য কোনো গরজ দেখায়নি কখনো। অনেকদিন পৃথাকে দেখেও কোনো কথা বলেনি।

রজত বললো, আর একটু চা দেবে, পিউ? ঘুমটা ঠিক যেন কাটছে না।

এবারে কাপটা নেবার সময় রজতের আঙুলের সঙ্গে পৃথার আঙুলের সামান্য ছোঁয়া লাগলো। রজত তা লক্ষ্যই করলো না।

এই সময় ব্যস্তসমস্তভাবে এলো আরতি। পৃথার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী রে, আমার চা জুড়িয়ে গেছে?

রজত বললো, নাঃ এখনো চলতে পারে।

আরতি ছটফটে ভঙ্গিতে চেয়ার টেনে বসলো, তার শরীরে একটা ব্যস্ততার ভাব। যেন কোনো একটা বাক্য অসমাপ্ত রেখে উঠে এসেছে, এক্ষুণি তাকে ফিরে যেতে হবে।

তবু চায়ে চুমুক দিয়ে সে পৃথাকে জিজ্ঞেস করলো, পৃথা তোর কী কথা আছে বলছিলি? এখন সেরে নিবি, না আর একটু বসতে পারবি?

বোস না, রজতের সঙ্গে গল্প কর।

রজত বললো, আমিই তো বকবক করছি তখন থেকে, ও কিছুই বলছে না। ওর কী যেন হয়েছে আজ।

পৃথার মাথাটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে, সে যেন আর বসে থাকতে পারবে না, টেবিলের একটা কোণ চেপে ধরলো। মুখখানা একেবারে রক্তশূন্য। স্থির দৃষ্টি।

তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো আরতি। উদ্বিগ্নভাবে বললো, এ কী, কী হয়েছে তোর, পৃথা?

রজত বললো, পিউ, পিউ, তোমার শরীর খারাপ লাগছে?

পৃথা উঠে দাঁড়ালো। চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে। অন্ধকার ঘর। শুধু জ্বলছে একটা লাল বাল্‌ব। তার পাশে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষ, তার গরম নিঃশ্বাস লাগছে পৃথার বুকের ঠিক মাঝখানে।

বিকৃত গলায় পৃথা বলে উঠলো, আরতি মাসি আরতি মাসি, তুমি আমায় ক্ষমা করো।

তারপরই সে ঝপ করে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

তারপর কেটে গেছে সাত বছর।

নভেম্বর মাসের এক বিকেলে একটা বাংলোর বারান্দায় বসে আছে পৃথা। সঙ্গে তার বান্ধবী অপালা, আর তার স্বামী সমীরণ। জায়গাটার নাম লোহারক্ষেত, কুমায়ুন অঞ্চলের ছোট্ট একটি গ্রাম। দিগন্তে মেঘচুম্বী পাহাড় থাকলেও এ জায়গাটা সমতল। চাষবাস হয়। গ্রামের মাঝখান চিরে চলে গেছে একটা ছোট্ট নদী কিন্তু স্রোত আছে বেশ।

জায়গাটার এমনই একটা স্নিগ্ধ শ্রী আছে যে চোখ জুড়িয়ে যায়। দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে ইচ্ছে করে। বিকেল পর্যন্ত খুব একটা শীত থাকে না, কিন্তু অন্ধকার যেই নামতে শুরু করে, অমনি তার সঙ্গে ঝুপ ঝুপ করে নামে শীত। তখন আর এই বারান্দায় বসে থাকা যায় না।

বাংলোটি ভারি চমৎকার। এত ছোট জায়গায় এত বড় বাংলোও অপ্রত্যাশিত। নিচে চারখানা ঘর, ওপরে দু'খানা। ওপরের ঘর দুটোই বেশি ভালো, আলাদা বারান্দা, এই দুটি ঘরই নিয়েছে ওরা।

অনেকক্ষণ ওরা চুপ করে রাস্তার দৃশ্য দেখছিল। অপালার পাঁচ বছরের

মেয়ে তৃষা খেলা করছে দু'তিনটি পাহাড়ী ছেলেমেয়ের সঙ্গে। ওদের এখানে তিন দিন কেটে গেল।

স্তব্ধতা ভেঙে সমীরণ বললো, এ জায়গা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে, বলো? আমার এরকম ছোট জায়গাই ভালো লাগে।

অপালা বললো, আমার তো আলমোড়াতেও থাকতে ইচ্ছে করলো না। এত টুরিস্টের ভিড়! সব জায়গায় বাঙালি!

পৃথা বললো, আমারও ছোট জায়গাই ভালো লাগে। চুপচাপ বসেই তো সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়।

সমীরণ বললো, সারাদিনে ক'কাপ চা খাচ্ছি, বলো? সাত-আট কাপ তো হবেই। চায়ের স্বাদও এখানে ভালো লাগে।

পৃথা বললো, অপালা, দ্যাখ, তোর মেয়ে কী সুন্দর হিন্দি বলছে ওদের সঙ্গে!

সমীরণ বললো, বাচ্চারা ঠিক ভাব জমিয়ে নিতে পারে।

অপালা বললো, এই যে লোকটা যাচ্ছে, ওকে দু'-তিনবার দেখলাম, ও কি বাঙালি বলে মনে হয়?

সারা মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় একটা শোলার টুপি, হাতে একটা লাঠি, ওভারকোট পরা একজন লোক আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে সামনের রাস্তা দিয়ে।

সমীরণ বললো, না বোধহয় পাঞ্জাবি। স্টেশনারি দোকানটার সামনে ওকে আমি দেখেছি। তখন রতনবাবুর সঙ্গে আমি বাংলায় কথা বলছিলাম, লোকটা আমাদের দিকে ফিরে তাকালো না।

অপালা বললো, আসবার পথে একজন সাধুর সঙ্গে দেখা হলো মনে আছে? সেই সাধুটি কিন্তু বাঙালি। এত দিন এই সব জায়গায় আছে যে বাংলা ভুলে গেছে। কিন্তু দহি না বলে দই বলছিল।

সমীরণ বললো, সেই সাধুটিকেও আমি এখানে দেখেছি। আমারও মনে হয় সে বাঙালি।

পৃথা বললো, তা হলে আমরা আর কোথাও যাচ্ছি না, এখানেই থাকছি?

সমীরণ বললো, ম্যানেজারকে বলেছি আমাদের আরও তিন দিন বুকিং বাড়িয়ে দিতে। সে একটু তা-না-না-না করছে বটে, আরও কাদের যেন আসবার কথা আছে। দাঁড়াও, ব্যাটাকে আর একবার ভজিয়ে আসি!

সমীরণ উঠে গেল।

অপালা এবার পৃথাকে জিজ্ঞেস করলো, সম্বিৎ কি তোকে এখনো জ্বালাতন করছে? দিল্লিতে কি হঠাৎ তোর সঙ্গে দেখা হলো, না ইচ্ছে করে তোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যই এসেছিল?

পৃথা একটু হেসে বললো, ও একটা পাগল!

অপালা বললো, সম্বিৎ কিন্তু অনেকদিন থেকে তোর জন্য...তুই একটা কিছু ঠিক কর, পৃথা! জীবনটাকে নিয়ে কত আর এক্সপেরিমেন্ট করবি!

পৃথা বললো, ইচ্ছে করে তো করছি না। এমনি এমনি গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

—তোর এখনো সেই গণ্ডগোলটা হয়?

—হয়। কী রকম যেন একটা তালা লেগে আছে। কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না। চেষ্টা করলাম তো অনেক রকম।

—অদ্ভুত ব্যাপার সত্যি। আমার কিছু হলো না। আর তোর বেলা, কিছুই ঘটলো না, অথচ....। ওষুধপত্তরেও কিছু হচ্ছে না!

—ওষুধ-টষুধ সব বাজে!

মেয়ে জামায় ধুলো লাগিয়ে উঠে এলো ওপরে, তাকে নিয়ে ঘরে চলে গেল অপালা। একাই বসে রইলো পৃথা।

অপালা জোর করেছিল বলেই পৃথার এখানে বেড়াতে আসা হলো। নিজে উদ্যোগ নিয়ে তার কোথাও যাওয়া হয় না। ব্যাঙ্গালোরে একটা ছোট হোটেলের ঘর নিয়ে থাকে পৃথা। মাসের পর মাস হোটেলে থাকাটা অনেকের কাছে আশ্চর্য লাগে, কিন্তু পৃথা বেশ ভালোই আছে। খরচ বেশি পড়ে বটে, কিন্তু কাজের লোক রাখার ঝামেলা নেই। রান্না-বান্নার দরকার নেই, এমনকি জামা-কাপড়ও কাচতে হয় না। মাইনের আদ্ধেক টাকাই এতে চলে যায়। অফিস থেকে এখনো কোয়ার্টার দিতে পারেনি, দেবার কথা আছে, তার আগে আর বাড়ি ভাড়া নিতে চায় না পৃথা।

কলকাতার স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটেই প্রথম চাকরি পেয়েছিল পৃথা। তারপর ব্যাঙ্গালোরের কাজটা পেয়ে সে বেশি খুশি হয়েছে। কলকাতায় তার থাকতে ইচ্ছে করে না।

জীবনটাকে জটিল করতে চায়নি পৃথা, তবু সবই কেমন যেন ওলোটপালোট হয়ে গেল। একটা অদ্ভুত অসুখে সে ভুগছে। ডাক্তাররা কী বুঝবে, নিজেই সে এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না।

সেবারে পরীক্ষার আগে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, গুরুতর কিছু নয়, দাঁতে দাঁত চেপে সে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় বসেছে। সেবারে বাবা খুব সাহায্য

করেছিলেন। বাবা নিজের সব কাজ ফেলে রোজ পৃথাকে নিয়ে যেতেন পরীক্ষার হলে। লিখতে লিখতে এক এক সময় পৃথার মাথাটা অন্ধকার হয়ে যেত, সে তখন কামড়ে ধরতো নিজের হাত। নিজেকে খুব ব্যথা দিয়ে সে চেতনা ফিরিয়ে আনতো।

রেজাল্ট অবশ্য তেমন ভালো হয়নি। ফার্স্ট ক্লাস পেল না, সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে, তার ওপরে তিন জন। চাকরিটা পেতে অবশ্য অসুবিধে হয়নি। বাড়িতে সবাই খুশি।

কিন্তু মাঝেমাঝেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কথা নেই বার্তা নেই, মাথাটা অন্ধকার হয়ে যায়, গায়ে লাগে কার গরম নিশ্বাস। তারপর সে ঢলে পড়ে মাটিতে। অফিসে কিংবা রাস্তা-ঘাটে এরকম হয় না, যখন সে একা থাকে কিংবা কোনো ছেলে বন্ধুর সঙ্গে। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এটা মৃগী নয়। ইসকিমিয়া কিংবা হার্টের অসুখ নয়, তার হার্টে কোনো দোষ নেই। স্পন্ডিলাইটিস-এও নাকি এরকম হয়, কিন্তু সে রোগের আর কোনো লক্ষণ তো নেই তার শরীরে।

পৃথা জানে, ঐ অন্ধকার দৃশ্যটা কোথাকার। রজতের ডার্করুম, রজত তার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি দেখাচ্ছিল। রজত কোনোরকম অসভ্যতা করেনি, খাঁটি ভদ্রলোকের মতন তার ব্যবহার, তবু পৃথার মাথায় এটা একটা ভয়ের দৃশ্য হিসেবে গেঁথে গেল কেন ? খারাপ কোনো অভিজ্ঞতা হলে মানে বোঝা যেত ! অপালাও সেই কথা বলে। ডাক্তারদের তো সব ব্যাপার জানানো যায় না। শুধু অপালাকেই সবটা খুলে বলেছিল পৃথা। অপালা বলেছিল, আমার জীবনে যা ঘটেছে, আমার নিজের মেসো জোর করে আমার বুকের জামা ছিঁড়ে দিয়ে...তবু তো আমি সেই ঘেন্না কিংবা ভয়ের অভিজ্ঞতাটা মনের মধ্যে পুষে রাখিনি ! একেবারে ঝেড়ে ফেলেছি। তোর এরকম হলো কেন ?

আর একটা কথা অপালাকেও বলতে পারে না পৃথা। কিছুদিন পরেই অজ্ঞান হবার আগের ঐ দৃশ্যটায় কিছু বদল হয়েছিল। অন্ধকার ঘরে পৃথা একেবারে নগ্ন। রজতের ড্রয়ারে যে নগ্ন মেয়েটির ছবি দেখেছিল, পৃথাই যেন সেই মেয়ে। পৃথা সব পোশাক খুলে দাঁড়িয়েছে, রজত ফ্ল্যাশ জ্বেলে তার ছবি তুলবে। এই সময় পৃথা ভয়ে চিৎকার করে জ্ঞান হারায়।

তার মানে কি পৃথা নিজেই চেয়েছিল ওরকম একটা কিছু ব্যাপার ঘটুক ? অন্ধকার ঘরে রজত তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলে সে খুশি হতো ? ফটোগ্রাফার রজতের সামনে তার নগ্ন হবার ইচ্ছে হয়েছিল ? নিজেই এই

প্রশ্ন তুলে পৃথা না-না-না-না বলে চেঁচিয়ে ওঠে। এরকম হতেই পারে না। একে কী বলে অবচেতন আকাঙ্ক্ষা? তাই বা কি করে হবে? আরতি আর রজত দু'জনকেই সে শ্রদ্ধা করে। তাছাড়া তার পুরুষ বন্ধুর অভাব নেই। কলেজ জীবনে অনেক ছেলেই তার রূপের প্রশংসা করেছে, সম্বিৎ আর শুভঙ্করের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল, ওদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করেছে, তার ওরকম বিকৃত ইচ্ছে জাগবে কেন? না, এটা পৃথা কিছুতেই মানতে পারে না।

কিন্তু অসুখটা রয়েই গেল। এভাবে তো জীবন কাটানো যায় না!

অপালাই জোরজার করেছিল বেশি, তাই দু'বছরের মাথায় পৃথা বিয়ে করে ফেললো শুভঙ্করকে। সম্বিৎ সাবধান করে দিয়েছিল, পৃথা, এমনভাবে বিয়ে করতে যেও না, আমিই তোমার প্রকৃত বন্ধু।

বিয়েটা টিকলো না তিন বছরের বেশি। তার জন্য সম্বিৎই অনেকটা দায়ী। সম্বিৎ নাছোড়বান্দার মতন লেগে রইলো, যখন তখন ওদের বাড়িতে আসে। শুভঙ্কর ক্রমশ সেটা অপছন্দ করতে লাগলো। পৃথার সঙ্গে তার শয্যা-সম্পর্কও স্বাভাবিক হলো না। মাঝে মাঝেই পৃথা বিকারগ্রস্তের মতন ব্যবহার করে। চোখ বুজে না-না বলে চিৎকার করে ওঠে, খাট থেকে দ্রুত নেমে ছুটতে গিয়ে পড়ে যায়। বাথরুমে অজ্ঞান হয়।

শুভঙ্কর ধরে নিল এর জন্য সম্বিৎই দায়ী। এরকম বিয়ে বেশিদিন টিকতে পারে না।

বন্ধুবান্ধবরা বললো, সম্বিৎ নিজের বিয়েটা টিকিয়ে রাখতে পারেনি বলেই সে অন্যদের বিয়ে ভেঙে আনন্দ পায়।

পৃথা জানে, দোষ তার নিজের। মাঝে মাঝে তার মাথাটা যে অন্ধকার হয়ে যায়, সেটা অন্য কোনো পুরুষ মেনে নেবে কেন?

পরীক্ষার পর আরতির বাড়িতে মাত্র একবারই গিয়েছিল পৃথা। রজত সে সময় বাড়ি ছিল না। দু'-একদিন রাস্তায় রজতের কাছাকাছি এসেও পৃথা তাকে এড়িয়ে গেছে। এই সাত বছরের মধ্যে রজতের সঙ্গে তার একটাও কথা হয়নি।

এখন পৃথা ধরে নিয়েছে, একমাত্র সময়ের ওপরেই ভরসা করা যায়। সময়ে আস্তে আস্তে তার এই রোগ সেরে যেতে পারে। ভয়ে সে এখন কোনো সিনেমা দেখতেও যায় না। একদিন একটা বিদেশি সিনেমায় খুব ঘনিষ্ঠ প্রেমের দৃশ্য দেখে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

তার জীবন থেকে কি প্রেম একেবারে বাদ হয়ে যাবে?

অন্য কেউ তাকে সাহায্য করতে পারবে না।

সন্ধে প্রায় হয়ে এসেছে, একজন লোক এই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। কার যেন নাম ধরে ডাকছে।

গলার স্বর শুনে কেঁপে উঠলো পৃথা। সে ঠিক শুনছে, না কল্পনা করছে? উঠে গিয়ে সে রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়ালো।

দীর্ঘকায় সেই লোকটি সারা মুখে দাড়ি-গোঁফ, মাথায় টুপি, হাতে একটা লম্বা লাঠি, গলায় ঝোলানো ক্যামেরা। দেখলে চেনা যায় না, কিন্তু এই কণ্ঠস্বর নিশ্চিত রজতের। কিন্তু লোহারক্ষেতের মতন একটা অখ্যাত জায়গায় পৃথার সঙ্গে সঙ্গে রজতও এসে পড়বে, এ কি সম্ভব? এতখানি কাকতালীয় কি জীবনে ঘটে!

পৃথা ছুটে গিয়ে অপালাকে ডেকে আনলো। তীব্র গলায় বললো, তুই দ্যাখ তো? আমি কি কানে ভুল শুনছি? ঐ লোকটি কি রজতদা?

অপালা বললো, আমি তো আগেই বলেছিলাম, ওকে আমার বাঙালি মনে হয়েছিল। নিচে গিয়ে কথা বলে দ্যাখ না।

পৃথা বললো, তুই গিয়ে দেখে আয়। আমার কেমন যেন ভয় করছে!

অপালা বললো, ভয়ের কী আছে? ভুল হলে ভুল হবে। আমি কি রজতদাকে ভালো চিনি?

দুই সখীই নেমে গেল নিচে।

সেই লোকটি বাংলোর ম্যানেজারের সঙ্গে হিন্দিতে কী যেন বলছে, ওরা কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতেই সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। পর্যায়ক্রমে দু'জনের মুখের ওপর চোখ বোলালো, একটুখানি ভুরু কুঁচকে গেল তার, তারপর ঠোঁটে ফুটে উঠলো হাসি। সে বললো, পিউ? তাই না?

তা হলে জীবনে এরকম কাকতালীয় সত্যি সত্যি কখনো ঘটে। এই লোকটি রজতই বটে।

এই রকম অবস্থায় কী খবর, কবে এলেন, একা এসেছেন নাকি, আসুন, আমাদের সঙ্গে চা খাবেন আসুন, এই ধরনের কথাই স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথা সে রকম কিছুই বলতে পারলো না, সে চুপ করে তাকিয়ে রইলো এক-দৃষ্টে। এ মানুষটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছে কয়েকবার মাত্র, কথাবার্তাও হয়েছে অতি সাধারণ। কিন্তু এই মানুষটির ভূমিকা তার জীবনে যে কতখানি তা আর কেউ জানে না। রজত অবশ্যই কিছু জানে না।

অথচ এতদিন পরেও দেখা হবার পর রজত তাকে ডাক নামেই ডাকলো।

অপালাই সাধারণ ভদ্রতার কথাগুলো চালিয়ে যেতে লাগলো। রজত

জানালো যে কিছুদিন ধরে সে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছবি তোলার জন্য। ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার জন্য সে একটা ছবির ফিচার তৈরি করছে। এখানে সে দাড়ি কামায় না, কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে সে আশাই করেনি। সে থাকে গ্রামের মধ্যে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে। তার চা ফুরিয়ে গেছে বলে বাংলোর ম্যানেজারের কাছে চা চাইতে এসেছিল।

অপালা তাকে চা খাওয়াবার প্রস্তাব দিলে সে বললো, কাল সকালে এসে আপনাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবো। আজ আমাকে ফিরতে হবে, কারণ একটি বাচ্চা ছেলে সারাদিন আমার বাড়ি পাহারা দেয়, সন্ধেবেলা আমি ফিরে গিয়ে তাকে ছুটি দিলে সে নিজের বাড়িতে যায়। সে ছেলেটি থাকে তিন মাইল দূরে। এরপর শীতের মধ্যে যেতে তার কষ্ট হবে।

অপালা জিজ্ঞেস করলো, আপনার রান্নাবান্না করে দেয় কে?

রজত বললো, আমি নিজেই রান্না করি। ডাল খুব ভালো তৈরি করি।

অপালা পৃথার দিকে তাকিয়ে বললো, যাবি নাকি, রজতবাবুর সংসারটা দেখে আসবো?

তারপর সে রজতকে জিজ্ঞেস করলো, কত দূরে? আমরা ফেরার সময় চিনতে পারবো?

রজত বললো, হ্যাঁ, চলুন না। ফেরার কোনো অসুবিধে নেই, সোজা রাস্তা।

সমীরণ কাছাকাছি নেই, বাংলোর ম্যানেজারকে বলে ওরা দু'জনে এগোতে লাগলো রজতের সঙ্গে।

পৃথা কোনো কথা বলছে না দেখে রজত নিজেই জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো, পিউ? অনেকদিন তোমাকে দেখিনি! আমি এখন আর কলকাতায় থাকি না, জানো তো? ছেলের কাছে থাকি দিল্লিতে।

পৃথা এবার জিজ্ঞেস করলো, আরতি মাসি কোচিং ক্লাস বন্ধ করে দিয়েছেন? নাকি দিল্লিতে?

রজত পৃথার চোখে চোখ রাখলো। তারপর বললো, ও, তুমিও তো এখন কলকাতায় থাকো না। তাই কিছু শোনোনি। আরতি নেই। চার মাস আগে হঠাৎ স্ট্রোক হয়।

পৃথা একটা গুরুতর আঘাত পাবার মতন শব্দ করলো।

অপালা আরতি কিংবা রজতকে ভালো করে চেনে না। এই সব খবরে তার খুব বিচলিত হবার কথা নয়। সে হঠাৎ থেমে পড়ে বললো, এই রে, মেয়েটাকে ঘরে একা রেখে এসেছি। কিছু বলে এলাম না। আমাকে

না দেখে যদি কান্নাকাটি শুরু করে? পৃথা, তুই ঘুরে আয়, আমি পরে যাবো।

ওদের কোনো কথা শোনার আগেই অপালা পেছন ফিরে প্রায় দৌড়োতে শুরু করলো।

পৃথা বুঝলো, রজতের সঙ্গে তাকে একা থাকার সুযোগ দিয়ে গেল তার বন্ধু। কিন্তু রজতের সঙ্গে একা যেতে তার ভয় করছে, তার বুক কাঁপছে। রজত আগের মতনই ভদ্র, একেবারেই বিপজ্জনক মানুষ নয়, তবু তার ভয় করছে!

তবু সে হাঁটতে লাগলো নিঃশব্দে। রজত যেন একটা চুম্বকের মতন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। পৃথার মনে পড়ছে আরতি মাসির কথা। তাকে ভালোবাসতো খুব। ইচ্ছে থাকলেও পৃথা আরতির সঙ্গে দেখা করতে পারতো না। ঐ বাড়িতে যাওয়া আর তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। রজত যে তার মাথায় ঐ অন্ধকার ঘরের অসুখটা দিয়েছে! অবশ্য রজতকে কোনোক্রমেই দোষ দেওয়া যাবে না।

পুরো সন্ধে হয়নি, আকাশ এখন রক্তিম, পশ্চিম দিগন্তে যেন বিশাল আগুন জ্বালিয়ে সোনা তৈরি করছে। যতক্ষণ আকাশে এই রঙের খেলা থাকে ততক্ষণ শীত তেমন প্রবল হয় না। পৃথার গায়ে সোয়েটারের ওপর শাল জড়ানো, রজতের গায়ে ওভারকোট।

গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা কুঁড়েঘর। পনেরো-ষোল বছরের একটি ছেলে বাইরে বসে একটা পাথরের ওপর ভোজালি ঘষে ধার দিচ্ছে। রজত দশ টাকার একটা নোট তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, আভি তুম যা সকতা।

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চলে গেল।

রজত বললো, আমার এখানে অন্য দামি জিনিস কিছু নেই, কিন্তু গোটা দুয়েক ক্যামেরা ও কয়েকটা লেন্স আছে, সেগুলোর জন্যই পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়। আগে একবার কসৌনিতে আমার ক্যামেরা চুরি গেছিল।

ঘর থেকে একটা মোড়া নিয়ে এসে রজত বললো, তুমি বাইরেই বসো পিউ, ভালো লাগবে!

সে একটা স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে কেটলিতে জল চাপিয়ে দিল।

পৃথার হঠাৎ মনে পড়লো, রজতের ড্রয়ারে সেই নগ্ন ছবিগুলোর কথা। ঐরকম ছবি যে তোলে তাকে তো তার ঘৃণা করার কথা। কিন্তু তাও তো সে পারেনি।

একটা টুলের ওপর দুটো কাপ, চিনি, দুধের পাত্র সাজিয়ে রাখতে' লাগলো রজত।

পৃথা জিজ্ঞেস করলো, আপনি বুঝি এখন বিদেশি পত্রিকায় ছবি দেন?

রজত বললো, চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। ছবি তোলার শখ আমার অনেক দিনের। প্রাইজ-ট্রাইজ পেতাম। এখন বাইরের কাগজ আমার ছবি নেয়। বেশ ঘুরে ঘুরে বেড়ানোও যায়। এবার কিসের ছবি তুলছি জানো? পাহাড়ী প্রজাপতি, এ পর্যন্ত আঠারো জাতের প্রজাপতি পেয়েছি, অন্তত তিরিশ রকম পাওয়া দরকার।

—আর কতদিন থাকবেন?

—যতদিন তিরিশটা না পাই। কাছেই সরযূ নদী আছে জানো তো? কাল থেকে সেই নদীর ধারে ধারে ঘুরবো। তুমি তো ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করছো, তাই না?

—আপনি কী করে জানলেন?

—কী করে যেন কানে এসে যায়। জলটা ফুটে গেছে মনে হচ্ছে। চা-টা কে বানাবে, তুমি না আমি?

—আমিই বানাচ্ছি।

রজত এসে পৃথার খুব কাছে দাঁড়ালো। সামনের পাহাড় আড়াল হয়ে গেল। যেন একটা স্মৃতিস্তম্ভ।

রজত গাঢ় স্বরে বললো, তোমার মনে আছে পিউ, একদিন আমাদের ফ্ল্যাটে, আরতি ছিল না, তুমি জানতে না আমি আছি, আমি জানতাম না আর কেউ আছে, এই সময় হঠাৎ আমি তোমাকে দেখতে পাই। মনে আছে?

পৃথা কেঁপে উঠলো। সেই দিনটার জন্যই তার জীবন বদলে যায়, তার মনে থাকবে না? বরং রজতের মনে থাকাটাই আশ্চর্যের কথা।

রজত বললো, সেদিনই যেন আমি তোমায় প্রথম দেখলাম। কিংবা বলা যায় আবিষ্কার করলাম। তুমি এমন একটা নিবিষ্ট ভঙ্গিতে বসেছিলে, যেন একটা ছবি!

পৃথা বললো, যাঃ, আমি কী আর এমন।

রজত বললো, অনেক দিন কেটে গেছে, তুমি এখন জীবনকে অনেক ভাবে চিনেছো, আমিও অনেক বন্ধন কাটিয়ে এসেছি, এখন সব কিছু খোলাখুলি বলা যায়! আমার একটা দুর্বলতার কথা স্বীকার করবো? অনেকদিন ধরে কথাটা জমে আছে, বলে ফেললে মুক্তি পাবো!

পৃথা ব্যাকুলভাবে চেয়ে রইলো রজতের দিকে।

রজত অনেকটা আপনমনেই বললো, আমি অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছি, ছবি তোলার জন্য মেয়েদের নানাভাবে দেখেছি, কিন্তু সেদিন হঠাৎ তোমাকে দেখে কিছু যেন একটা ঘটে গেল। আমি অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম!

পৃথা দুর্বলভাবে বললো, আমি ভেবেছিলাম, আপনি আমাকে লক্ষ্যই করেননি। আপনি কত মেয়েকে চেনেন, সেই তুলনায় আমি একটা এলেবেলে।

রজত বললো, তুমি মোটেই এলেবেলে নও। আর একটা সত্যি কথা বলবো? বলতে আমার ভালো লাগছে। তোমার কাছে স্বীকার করছি আমার দুর্বলতা। এতদিন বলতে পারিনি, তুমি যখন ডার্করুমে আমার ছবি দেখতে গেলে, অদ্ভুত একটা সারল্য ছিল তোমার ব্যবহারে, আমার পাশে তুমি দাঁড়ালে, হঠাৎ আমার কী যে হলো, খুব ইচ্ছে হলো তোমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে।

পৃথা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মিথ্যে কথা! না সত্যি?

রজত বললো, ওরকম আমার হয় না, আরতি মনে কষ্ট পাবে এমন কিছু আমি করিনি কখনো, আর তোমার বয়েস কম ছিল, সারা জীবন পড়ে আছে তোমার সামনে, আমার ব্যবহারটা যদি লোভের মতন মনে হয় তোমার কাছে, কিন্তু লোভ ছিল না, আমার খুব ইচ্ছে করছিল, তোমার ঐ সারল্যকে ছুঁই—

পৃথা যেন শুনতে পাচ্ছে, ঝনঝন শব্দে খুলে যাচ্ছে একটা তালা। মিশমিশে অন্ধকার ঘরটায় এসে পড়লো ঝলকে ঝলকে আলো, এত আলো, আলোয় আলোময় হয়ে গেল সেই ঘর, যেন একটা আলোর নদীতে সাঁতার কাটছে পৃথা।

রজত পৃথার পিঠে আলতোভাবে হাত ছুঁইয়ে বললো এতদিন পর সত্যি কথাটা তোমার কাছে স্বীকার করে আমি মুক্তি পেলাম পিউ!

উড়নচণ্ডী

নিরিবিলি পাড়া তো আর একটাও নেই কলকাতায়। এই বালিগঞ্জ সারকুলার রোড কিছুদিন আগেও দুপুরে শুনশান থাকতো। এখন সেখান দিয়ে বাস চলে। পুরোনো খোলামেলা প্রাসাদগুলো ভেঙে এখানে ওখানে গজিয়ে উঠেছে তালগাছের মতন ঢ্যাঙা খুপরি-বাড়ি।

তবু একটা আধটা পুরোনো কায়দার বাড়ি এখনো চোখে পড়ে। সামনে গেট, ভেতরে বাগান, সেই বাগানের মাঝখানে ঝর্না ও জলপরী, তারপর শ্বেতপাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে।

প্রিয় আর মিলা সেই রকম একটা বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। এখন দুপুর তিনটে।

শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে প্যাকেটটা প্রিয় ফেলে দিল রাস্তায়। তারপর বললো, বেশ বাড়িটা!

মিলা লোহার গেটটা ধরে দাঁড়িয়ে ভেতরের বাগানটা দেখছিল। তারপর বললো, বাড়িটা কার?

গেটের পাশে পাথরের ট্যাবলেটে নাম লেখা ছিল, কেউ সেটা ভেঙে তুলে নিয়ে গেছে। সেখানে এখন রয়েছে একটা চৌকো হাঁ।

প্রিয় বললো, আগেকার দিনের কোনো রাজা মহারাজার হবে নিশ্চয়ই। কুচবিহার কিংবা ত্রিপুরা কিংবা ধরো দীঘাপাতিয়ার—

মিলা বললো, দীঘাপাতিয়া জায়গাটা কোথায়?

—তা জানি না। অনেক গল্প-উপন্যাসে এই নামটা পড়েছি।

—এখন এই বাড়িতে কেউ থাকে? মনে তো হয় না।

—কী করে বুঝলে?

—দ্যাখো, তুমি এখানে এসে দ্যাখো, দোতলায় সব কটা ঘরের জানলা বন্ধ। মানুষ থাকলে এই দুপুরবেলা কেউ জানলা বন্ধ করে রাখে? ছাদে একটা কাপড়ও শুকোচ্ছে না।

—রাজা-মহারাজাদের বাড়িতে কক্ষণো ছাদে কাপড় শুকোয় না। বড়লোকদের বাড়ির নিয়ম এই। তুমি কোনোদিন জামা-কাপড় মেলা দেখতে পাবে না।

—তা বলে তারা কাচা জিনিস কোথায় শুকোতে দেয়?

—বাড়িতে কিছু কাচাকাচিই হয় না। সব ধোপার বাড়িতে যায়।

—গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া, পেটিকোট-ব্রা সব?

—ওদের তো আর ওসব জিনিস একটা আধটা থাকে না ; ডজন ডজন।

—চলো ভেতরে যাই!

—এই বাড়ির ভেতরে? কেন?

দীঘাপাতিয়ার বউরানীর কাছে জিজ্ঞেস করে আসি, তার কটা পেটিকোট!

—গুড আইডিয়া। রাজকুমারকেও জিজ্ঞেস করা দরকার, তার কটা গেঞ্জি। কিন্তু বাড়িতে যে কেউ নেই মনে হচ্ছে! এখন গ্রীষ্মকাল তো, বড়লোকরা এখন দার্জিলিং কিংবা সিমলা যায়।

—আর শীতকালে কলকাতায় আসে?

—হ্যাঁ। শীতকালে কত ভালো ভালো পাখি আসে কলকাতায়।

—আমরা গ্রীষ্মকালেও কলকাতা ভালোবাসি।

—আমরা বর্ষাকালেও কলকাতা ভালোবাসি।

—গ্রীষ্মকালে এই রকম একটা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার বিকেল দেখতে ইচ্ছে করে।

—চলো, মিলা। বিকেল হতে তো দেরি নেই, আমরা এই বাড়িটার বারান্দায় দাঁড়াই।

—প্রথমে আমি দাঁড়াবো বারান্দায়, তুমি থাকবে বাগানে। তুমি তৃষ্ণার্তভাবে তাকিয়ে থাকবে, আর আমি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলবো।

—ঠিক যে-রকম গল্পে থাকে!

—তারপর আমি একটা গান গাইবো...এই রে, আমি যে গান জানি না!

—গানের দরকার নেই। ওটা বড্ড হিন্দি সিনেমার মতন। আমি বরং বাগান থেকে একটা ফুল ছুড়ে দেবো তোমার দিকে...

—কী ফুল?

—পারিজাত...যদিও জানি না সে ফুল কী রকম দেখতে! যাই হোক, একদম অচেনা একটা ফুল...

গেটে কোন লোক নেই, তালাও নেই। একটু ঠেলাতেই সেটা খুলে গেল।

দুজনে মৃদু পায়ে হাঁটতে লাগলো সুরকির পথ দিয়ে। এত দামি রাস্তায় এতখানি বাগান এখনো খালি পড়ে আছে, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য লাগে।

অবশ্য বাগান বলতে সেরকম কিছু নেই। কিছু গাছ বেঁচে আছে নিজস্ব প্রাণশক্তিতে, শৌখিন গাছেরা শুকিয়ে গেছে। ঝর্না দিয়ে আর জল পড়ে না। জলপরীর মুখটি ম্লান।

প্রিয় বললো জলপরীটা ঠিক তোমার মতন দেখতে না?

মিলা বললো, আমায় দেখেই তো তৈরি করেছিল; উনিশ শো দশ সালে। তখন আমার বয়স উনিশ।

তারপর থেকে আর তোমার বয়েস এক বছরও বাড়লো না। ঠিক এই মূর্তিটার মতন!

—তুমিই তো তৈরি করেছিলে, মনে নেই?

—কেন মনে থাকবে না? এই মূর্তিটা গড়ে যেদিন আমি এই বাগানে বসলুম, সেদিন দীঘাপাতিয়ার বড়কুমার আমায় বললো, কাকে দেখে এই মূর্তি গড়েছো ভাস্কর? সেই মেয়েটিকে আমার চাই।

—তুমি কী বললে?

—আমি বললুম, রাজকুমার, সে কথা আগে বলেননি কেন? তাকে আর এখন আমি কোথায় পাবো? মূর্তি গড়া যেই শেষ হলো, অমনি সে আবার ডুব দিল হিরণি ঝর্নার জলে। জল থেকে উঠে এসেছিল, আবার জলে ফিরে গেছে।

—এখন যদি সেই রাজকুমার আমায় দেখে ফেলে?

—সেই রাজকুমার এখন ঠাকুর্দা হয়ে গেছে; একটাও দাঁত নেই, তার তৃতীয় পক্ষের বউয়ের ভয়ে সব সময় কাঁপে।

—তা হলেও আমি কিন্তু ছাড়বো না। রাজকুমারকে দেখলেই বলবো, আপনার ভাস্কর আপনাকে ভাঁওতা দিয়েছিল। আমি জলে ফিরে যাইনি। এই তো আমি এসেছি। আপনি আমাকে চেয়েছিলেন!

একতলাতেও কোনো লোকজন দেখা গেল না। কিন্তু এবারে বেশ জোরালো একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল। ডাক শুনেই বোঝা যায় বেশ পেডিগ্রিয়ালা কুকুর। আর কুকুর যখন আছে, তখন মানুষও থাকবে নিশ্চয়ই।

প্রিয় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, আর যেও না।

মিলা বললো, আমি সামনে দাঁড়াচ্ছি, তোমার ভয় নেই। কোনো ভালো জাতের কুকুর মেয়েদের কামড়ায় না।

—সত্যি? তুমি জানলে কী করে?

—মেয়েরা অনেক কিছু বেশি জানে!

খাকি প্যান্ট ও গেঞ্জিপরা একজন লোক এবারে বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। ভুরু কুঁচকে তাকালো।

প্রিয় আর মিলা একটা বুড়ো ম্যাগনোলিয়া গাছের কাছে চলে গেল। মিলা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো সেই গাছের পাতাগুলো।

গেঞ্জিপরা লোকটা সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী চাই?

মিলা ফিসফিস করে প্রিয়কে জিজ্ঞেস করলো, এই কি ছোট রাজকুমার?

প্রিয় বললো, রাজকুমারদের কক্ষণো নাক বোঁচা হয় না। এ নিশ্চয়ই নায়েব-গোমস্তা ধরনের কেউ। কিংবা লেখাপড়া জানা দারোয়ান।

মিলা লোকটির প্রশ্নের উত্তরে বললো, এই গাছটায় ফুল ফোটে না?

লোকটি বললো, না।

—কোনোদিন ফোটে না? না, এখন দু-এক বছর ফুটছে না।

—আমি কোনোদিন ফুল ফুটতে দেখিনি।

—আপনি এখানে কতদিন আছেন?

—দশ-এগারো বছর।

—এ গাছটার বয়েস তার চেয়ে অনেক বেশি।

—আপনারা কাকে খুঁজছেন এখানে?

মিলা এবার তাকালো প্রিয়র দিকে।

প্রিয় বললো, অমিতকে একটু খবর দিন। বলবেন, দীনহাটা রাজবাড়ি থেকে প্রিয়লাল রায়চৌধুরী এসেছে। সঙ্গে তার বান্ধবী, রাজকুমারী মিলা।

লোকটি বললো, অমিত? অমিত কে?

—অমিত দেববর্মণ?

—আপনারা ভুল বাড়িতে এসেছেন। এটা তো লক্ষ্মণাবতী এস্টেটের বাড়ি।

ঠিক আছে লক্ষ্মণাবতীর বড় তরফকেই খবর দিন। বলবেন প্রিয়লাল রায়চৌধুরী এসেছেন, নাম শুনলেই চিনতে পারবেন।

—বাবুরা তো এখানে কেউ থাকেন না। এ বাড়ি নিয়ে মামলা চলছে। বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান যদি ঠিকানা দিতে পারি, রয়েড স্ট্রিটে থাকেন।

—থাক দরকার নেই। আপনার নাম কী?

—সুখেন্দু সিকদার।

—শুনুন, সুখেন্দুবাবু, এই যে আমার বান্ধবী, এর নাম মিলা, না, না,

নীলা নয়, সবাই প্রথমে শুনে তাই ভুল করে। এ হচ্ছে মিলা। এখন মিলা কথাটার মানে জানেন? কোনো মানে হয় না! তেমনি এই মেয়েটিরও ম্যাঝে মাঝে উদ্ভট শখ চাপে।

মিলা এবার বাধা দিয়ে বললো, মোটেই এটা উদ্ভট শখ নয়। আমি কি ডুব সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে চেয়েছি?

প্রিয় বললো, নদী নয়, সেবারে তুমি সমুদ্র পার হতে চেয়েছিলে, মনে নেই?

সুখেন্দু সিকদার রীতিমতন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। একথা ঠিকই মিলা সঙ্গে না থাকলে শুধু প্রিয়কে হুট্ করে গেট খুলে ভেতরে আসতে দেখলে সে অনেক রূঢ় হতো। কর্কশ গলায় কথা বলতো। পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা প্রিয়কে দেখতে একটা যে কোনো ঢ্যাঙা রাস্তার ছেলের মতন। এই ধরনের চেহারার ছেলেরা অনেক সময় বিপজ্জনক হয়।

কিন্তু মিলার চেহারা চট করে অবহেলা করা যায় না। রাস্তা দিয়ে কুড়িটা মেয়ে হেঁটে গেলে তার মধ্যে বড়জোর একজনের দিকে কয়েক পলক বেশি তাকানো যায়। সেই হিসেবে মিলাকে বলতে হবে ষাট জনের মধ্যে একজন। এরকম একটি মেয়ে এই উলুক-ঝুলুক চুলওয়ালা ছোকরার সঙ্গে কী করছে?

সুখেন্দু সিকদার বললো, আপনারা ভেতরে এসে বসুন না!

প্রিয় তার উত্তরে ঘোষণা করলো, না, আমরা বসবো না, আমরা ওপরের বারান্দায় দাঁড়াবো।

—ওপরের বারান্দায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেটাই এই মেয়েটির শখ। বললুম না, বড্ড খামখেয়ালি মেয়ে, ওর শখ হয়েছে এই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিকেল দেখবে।

সুখেন্দু আবার ধাঁধায় পড়ে। সে যে জগতে থাকে, সেই জগতে বিকেলটা কোনো দেখবার জিনিস নয়। বিকেল কি কোনো মিছিল না দাঙ্গা যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে হবে? বাংলা কথারও মানে বোঝা যায় না সব সময়। তার সন্দেহ হয়, এদের কোনো মতলব আছে।

সে বললো, দোতলায় যাবেন। কিন্তু আমার কাছে তো চাবি নেই।

—চাবির দরকার কী? আমরা তো কোনো ঘরে ঢুকতে চাইছি না, শুধু বারান্দায় দাঁড়াবো।

—সিঁড়ির কোলাপসিব্‌ল গেট-এ তালা লাগানো। সে চাবি আছে বড়বাবুর কাছে।

—তা হলে বলতে চান, এ বাড়ির দোতলায় আর কেউ যেতে পারে না? এমনি এমনি এ রকম একটা চমৎকার বারান্দা বিকেলবেলা খালি পড়ে থাকে?

—শুধু বিকেল বলছেন কেন, সারা দিন রাতই তো খালি! কোর্টের অর্ডার ছাড়া চাবি খোলার উপায় নেই।

—এ বাড়িটার দাম কত?

—কী বললেন? বাড়িটার দাম...

প্রিয় এবার মিলার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমাকে তা হলে আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। মামলা তো কোনো দিন মিটবে না, একদিন এই বাড়িটা নিলাম হবে, তখন আমি কিনে নেবো! এখন চলো!

মিলার মুখে অভিমানের ছায়া।

প্রিয় সুখেন্দুকে বললো, চলি, কেমন? আপনার বড়বাবুকে বলবেন, আমরা এসেছিলাম।

মিলা সতৃষ্ণভাবে শেষবার বাড়িটার বারান্দায় গ্রিলের দিকে তাকিয়ে পেছন ফিরলো!

সুখেন্দু দাঁড়িয়ে রইলো নির্বাকভাবে। এরপর অনেক দিন ধরে সে এই অদ্ভুত যুগলের কাহিনী শোনাবে তার চেনাশুনো লোকদের।

গেটটা পেরিয়ে যাবার পর প্রিয় বললো, সিঁড়ির মাঝখানে গেট, তাতে তালা আটকান, এটা আমার মাথাতেই আসেনি আগে। যাকগে, ঠিক আছে চলো, আমি তোমায় মনুমেন্টের ওপর থেকে বিকেল দেখাবো।

মিলা বললো, আমি আর কোনো জায়গা থেকে বিকেল দেখবো না।

—এর থেকে আরও অনেক ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। যেমন ধরো টাটা বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে। গঙ্গা যে বাঁক নিয়েছে তাও দেখা যায় ওখান থেকে।

—অত উঁচু বাড়ি আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। বাড়ি হবে দোতলা, ব্যাস। আমগাছের মতন তার অনেক ডালপালা থাকবে, অনেক ঘর আর বারান্দা। তালগাছের মতন লম্বা বাড়ি, বিচ্ছিরি!

—আচ্ছা কটা দিন অপেক্ষা করো। বললুম তো, এই দোতলা বাড়িটাই আমি তোমায় কিনে দেবো!

—সেই ভালো! তাহলো চলো, এখন আমরা চা খাই। আজ কিন্তু আমরা গ্র্যাণ্ড হোটেলে চা খাবো না। কোনো এয়ার কণ্ডিশানড্ রেস্তোরাঁতেও যাবো না। আমরা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ের চা খাবো।

—হাঃ হাঃ হাঃ ! চমৎকার আইডিয়া। সাধারণ, গরিব-দুঃখী লোকরা কী রকম জীবন কাটায়, সেটাও তো আমাদের দেখ্‌তে হবে। আশাকরি আমাদের ছদ্মবেশটা কেউ ধরতে পারবে না। আমরা আজ যা পোশাক পরেছি, তাতে যে-কেউ ভাববে আমরা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছি। কেউ জানবে না যে তুমিই রাজকুমারী মিলা।

—আর তুমি আমার দেহরক্ষী প্রিয়লাল।

—চলুন রাজকুমারী, আমরা এখন ভাঁড়ের চা খাবো। ময়দানে ওরা কলসীতে চা নিয়ে বসে।

—আমরা কি হেঁটে যাবো, না বাসে ?

—অবশ্যই হেঁটে যাবো। এমন মেঘলা-মেঘলা দুপুরে ভিড়ের বাসে চাপে শুধু মুখ্যুরা। তা ছাড়া বাসের কন্ডাকটাররা আমাদের চিনতে না পেরে পয়সা চাইবে।

—আমার কাছে শুধু মোহর আছে, খুচরো পয়সা নেই।

—চা-টা খাবার জন্য আমি সঙ্গে কিছু খুচরো পয়সা রেখেছি। চলুন, তাতেই হয়ে যাবে।

যখন এলগিন রোড ধরে ওরা ময়দানের দিকে এগোচ্ছে, সেই সময় দূর থেকে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষকে আসতে দেখে মিলা থমকে গেল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রিয়ও দেখলো মানুষটিকে।

প্রিয় বললো, দৈত্যদের রাজা নীতীশদা আসছে।

মিলা বললো, এখন কি আমরা ওর সঙ্গে দেখা করবো কিংবা কথা বলবো ?

প্রিয় বললো, আমাদের হাতে অত সময় নেই। দৈত্যরাজ নীতীশদা বড় বেশি কথা বলে। হয়তো তোমাকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতেও চাইতে পারে। ও একটা ভুল ধারণায় ভুগছে। ওর ধারণা, ও তোমার ছোটমামা।

—একেবারেই ভুল ধারণা। আমার মা-ই নেই, কী করে মামা থাকবে।

—ও সেটা বোঝে না।

—সুতরাং ?

—চলো, আমরা পাশের এই গলিটায় ঢুকে পড়ি, আপাতত আমরা ওকে দেখা দেবো না।

—দেখা দিয়ে ওকে ধন্য করবো না! বলো !

দুজনে চট করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে খুব মন দিয়ে দেয়ালের

একটা পোস্টার পড়তে লাগলো।

সেটা একটা সিনেমার পোস্টার। তাতে একজন লোকের হাতে একটা মশাল, আর একটি মেয়ে এমন কায়দায় শুয়ে আছে যাতে তার বুক ও নিতম্ব এক সঙ্গে দেখা যায়। ওরা হাসতে লাগলো।

মধ্যবয়স্ক লোকটি পার হয়ে যাবার পরে ওরা আবার বড় রাস্তায় এলো, পেছন দিকে আর তাকিয়ে দেখলো না।

ওদের আবার থামতে হলো। চৌরঙ্গির ওপর দিয়ে একটা রাজনৈতিক দলের মিছিল চলেছে। এই মিছিল শেষ না হলে ওরা রাস্তা পার হতে পারবে না।

মিলাকে দাঁড় করিয়ে রেখে প্রিয় দুটো খুচরো সিগারেট কিনে নিয়ে এলো। একটা পকেটে সাবধানে রেখে, ধরালো অন্যটা।

মিলা ফিসফিস করে বললো, এই পৃথিবীর মানুষগুলো বড় দুঃখী, তাই না? কেউ ছোট, কেউ বড়। কেউ অনেক বেশি পায়, কেউ কিছুই পায় না।

প্রিয় বললো, কেন যে এরা এত বোকামি করে? সবাই এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকে না!

—বয়েস কম তো, তাই ছেলেমানুষী যায়নি। একজন আরেক জনেরটায় ভাগ বসায়। এই পৃথিবীর মানুষেরা সত্যি এখনও নাবালক রয়ে গেছে। এর চেয়ে আমাদের মুকুটমণি ভালো।

—চুপ, কেউ শুনতে পাবে! কেউ যেন টের না পায় আমরা মুকুটমণি থেকে এসেছি।

—এরা নাম শুনলেও চিনতে পারবে না। আমরা যাবার আগে ওদের শিখিয়ে দিয়ে যাবো, কী করে সবাই মিলে সমান ভাবে মজা করে থাকা যায়, একটুও ঝগড়াঝাঁটি না করে—

—এক্ষুণি যাবার কথা বলো না। আমার তো খুব মায়া পড়ে গেছে এই পৃথিবীটার ওপর।

—আমারও বেশ ভালোই লাগে। তবে শহরগুলো নয়, শহরের বাইরে যেখানে খুব খোলামেলা, যেখানে নদী, যেখানে ধানক্ষেত।

—এই মিছিলটাও নদীর মতন। আমরা পার হতে পারছি না।

—সত্যিকারের নদী হলে আমরা সাঁতরে পার হয়ে যেতুম। আমরা অবশ্য আর একটা কাজ করতে পারি। আমরা এখান থেকে উড়ে চলে যেতে পারি ময়দানে।

—না আজ সব কিছুই সাধারণ মানুষের মতন করবো ঠিক করেছি যে।

—তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে আমরা বরং উল্টোদিকে হাঁটি। মিছিলের শেষ যেখানে, সেখান দিয়ে রাস্তা পার হবো।

চঞ্চলভাবে সেই রকম উল্টো দিক উজিয়ে ওরা রাস্তা পার হলো। তারপর প্রায় ছুটে চললো ময়দানের দিকে।

চায়ের বদলে আগে চোখে পড়লো একটা ফুচকাওয়ালা। রবীন্দ্রসদনের সামনে।

মিলা সেখানেই দাঁড়িয়ে বললো. রাজকুমারী আগে ফুচকা খাবেন ঠিক করেছেন।

প্রিয় পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিয়ে একবার দেখলো। ঝনঝন করে উঠলো খুচরো পয়সা।

সে বললো, রাজকুমারী একলা খাবে। দেহরক্ষী শুধু দেখবে।

—রাজকুমারী একলা কিছু খায় না। আমাদের সব খাওয়াই চুমুর মতন, দু'জনে মিলে না খেলে হয় না।

—তাহলে অন্য কিছু না খেয়ে শুধু চুমু খেলেই হয়।

—এখানে? এই রাস্তায়, এত লোকের মাঝখানে?

—চলো আমরা রবীন্দ্রসদনের গ্রিনরুমে ঢুকে যাই। কেউ যদি কিছু বলে, আমরা বলবো, আমরা অদ্য রজনীর নায়ক-নায়িকা। আমরা গ্রিনরুমে শেষবার রিহার্সাল দিতে এসেছি।

—চলো।

কিন্তু ওদের রবীন্দ্রসদনেও ঢোকা হলো না। সিঁড়িতে দুজন যুবক দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তাদের একজন ওদের দিকে তাকাতেই প্রিয় বললো, শিগগির মুখ ফেরাও মিলা। ওরা আমাদের ছদ্মবেশ চিনে ফেলতে পারে। অজিতেশ আর মলয় দাঁড়িয়ে আছে ওখানে।

মিলা চট করে আঁচলটা তুলে ঘোমটা দিয়ে ফেললো মাথায়। প্রিয় হনহন করে হেঁটে গেল। অনেকখানি গিয়ে প্রায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের সামনে দাঁড়ালো।

মিলা ধীর পায়ে হেঁটে আসছে।

কাছে এসে মিলা বললো, আমাদের মত পালটানো ঠিক হয়নি। চলো, ভিকটোরিয়ার সামনে গিয়ে চা খাই।

প্রিয় গম্ভীরভাবে বললো, আমাদের এত চেনা লোক থাকা উচিত নয়।

এর পর থেকে আর কারুকেই আমরা চিনতে পারবো না।

—সেই ভালো।

একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল কলসীর চা। এতে চা-এর চেয়ে আদার গন্ধই বেশি। তবু বেশ লাগে। কয়েক চুমুকেই ছোট খুরি ফুরিয়ে যায়। কাছাকাছি অনেক রকম চাটের দোকান। আলুকাবলি, পাও ভাজি, টিকিয়া, ঝালমুড়ি। দেখলেই জিভে জল আসে।

প্রিয় চায়ের দাম দিয়েছে, আর তার কাছে আছে অতি সামান্য পয়সা।

মিলা বললো, এবার আমি তোমায় খাওয়াবো। তুমি এখানে চুপটি করে একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।

প্রিয় মিলার হাত চেপে ধরে বললো, আজ থাক। আজ ওর ওসব কিছুই দরকার নেই।

মিলা বললো, উঁহুঃ, এরকম তো কথা ছিল না। তুমি আমার কোনো ইচ্ছেতে বাধা দেবে না, এই রকমই ঠিক ছিল মনে নেই?

—চলো তা হলে গ্র্যান্ড হোটেলে যাই! সেখানে তোমার যা ইচ্ছে খাবে। সেখানে আমার পয়সা লাগে না, বিলে সই করে দিলেই হয়।

—না, মশাই! আজ তো আমরা সাধারণ গরিব লোকের মতন খাবার খাবো! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমার একশো গজের মধ্যে আসবে না।

মিলা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কোমরে গোঁজা রুমালটা দিয়ে মুখ মুছলো। তারপর হাঁটতে লাগলো আস্তে আস্তে।

একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মিলা মানুষ দেখতে লাগলো। এখান থেকে প্রিয়কে দেখা যায়, কিন্তু মিলা সেদিকে তাকাচ্ছে না। সে রাস্তার মানুষের মুখ পছন্দ করছে।

একজন বেশ ভালোমানুষ মতন চেহারার লোক মিলাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারপর সিগারেট ধরাবার ছলে আড়চোখে দেখতে লাগলো মিলাকে। চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে। মিলা রাগ করে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। তার ভঙ্গিটা এমন, যেন সে তার প্রেমিকের প্রতীক্ষা করছে।

যুবকটি বারবার মিলার দিকে ফিরে ফিরে দেখতে দেখতে চলে গেল।

এরপর একটি প্রৌঢ় আকৃষ্ট হলো মিলাকে দেখে। যুবকদের চেয়ে প্রৌঢ়রা সাধারণত নির্লজ্জ হয়। লোকটি মিলার কাছে এসে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, যাবে?

মিলা বললো, আপনি ভুল মেয়ের কাছে এসেছেন।

লোকটি তবু বললো, আমার জায়গা আছে। যাবে?

মিলা বললো, আমি মনে মনে ঠিক দশ গুনবো। তার মধ্যে যদি আপনি চলে না যান—

লোকটা এবার রাগের সুরে বললো, তা হলে পটের বিবি সেজে গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে আছো কেন?

—আপনি কি এই গাছটার মালিক?

লোকটি আর দাঁড়ালো না। অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করে চলে গেল হনহনিয়ে।

এবারে এলো এক সঙ্গে তিনটি ছেলে। তারা হাসাহাসি ও গল্প করতে করতে আসছিল, মিলার দিকে চোখ পড়ায় তাদের গতি কমে এলো। তিনজনেই পর্যায়ক্রমে দেখলো মিলাকে।

এবারে মিলার মুখে হাসি ফুটলো। সে এগিয়ে এলো ছেলে তিনটির দিকে।

—শুনুন।

ছেলে তিনটির মুখে ফুটে উঠলো অকপট বিস্ময়। তারা মিলার আপাদমস্তক দেখলো। মিলার চেহারায় কিছু একটা আছে, যে-জন্য তাকে ঠিক রাস্তার মেয়ে মনে হয় না।

পরিষ্কার আড়ষ্ট গলায় মিলা বললো, আমার দশটা টাকার দরকার। আপনারা কেউ দিতে পারবেন?

ছেলে তিনটি পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। কে প্রথম কথা বলবে ঠিক করতে পারছে না।

মিলা আবার বললো, আমার হঠাৎ খুব দরকার পড়ছে। আমি আপনাদের পরে শোধ দেবো।

অতি সরল বাংলা বাক্য, তবু যেন বুঝতে পারছে না ছেলে তিনটি। এবারে ওদের মধ্যে থেকে চশমা-পরা লম্বা মতন ছেলেটি বললো, আপনি কী বলছেন?

—আমার দশটা টাকার দরকার। আপনারা কেউ দিতে পারবেন?

—কেন? মানে, আপনার কী হয়েছে?

—সেটা বলবো না। আমার শুধু দশটা টাকা দরকার। আপনাদের ঠিকানা দিলে আমি কোনো সময় মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেবো।

—আপনি কি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন? দরকার হলে আপনাকে আমরা বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি।

—না, তার কোনো দরকার নেই। আমি নিজেই যেতে পারবো।

—চলুন না আমরা পৌঁছে দিচ্ছি।

—আমি অচেনা ছেলেদের সঙ্গে কোথাও যাই না। মাপ করবেন।

—আপনি এখানে একলা একলা দাঁড়িয়ে...টাকা চাইছেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আপনারা কি আমাকে খারাপ ভাবছেন? তা হলে আপনাদের টাকা দিতে হবে না!

তিনটি ছেলে যেন একসঙ্গে প্রতিযোগিতা দিয়ে বলে উঠলো, না না, না! খারাপ ভাববো কেন?

তারপর একজন বললো, আপনি নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছেন। বিপদে না পড়লে কেউ এরকমভাবে...মানে আপনার কী হয়েছে সেটা জানতে পারলে আমরা সাহায্য করতে পারি...

মিলা বললো, ঠিক বিপদ বলা যায় না। তবে খুবই দরকার। আপনাদের কাছে যদি এক্সট্রা টাকা থাকে, তা হলেই...

তিনজনের মধ্যে দু'জনেই পকেট থেকে দুটি দশটাকার নোট বার করে ফেলেছে। দু'জনই এগিয়ে দিল টাকা।

—আমার শুধু একটা দরকার।

—রাখুন না, দুটোই রাখুন।

—না। আমি দশটাকা চেয়েছি। আপনাদের ঠিকানা?

—ঠিকানা? মানে, আপনি কি এদিকে আসেন মাঝে মাঝে? এর পরের শনিবার যদি ঠিক এই সময়ে এখানে আসেন—

—না। আমি আর এখানে আসবো না। ঠিকানা দিন, টাকাটা পাঠিয়ে দেবো!

এবার তিনজনেই পকেটে হাত দিয়ে কাগজ, কলম খুঁজলো। কাগজ যদি বা পাওয়া গেল, কলম নেই কারুর কাছে। তা হলে কী করে ঠিকানা লেখা হবে?

চশমা-পরা লম্বা ছেলেটি বললো, যাঃ! দশটা টাকা ফেরত নেবার কোনো মানে হয়? শুনুন ঐ টাকাটা আপনি পরে কোনো গরিব-দুঃখীকে দিয়ে দেবেন।

মিলা এবারে মিষ্টি করে হেসে বললো, আচ্ছা, তাই হবে। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ!

তারপরেও দাঁড়িয়ে রইলো ছেলেগুলো। তারা যেন বুঝতে পারছে না

এখন কী করা উচিত।

মিলাই বললো, আপনারা যান, আমি একটু পরে যাচ্ছি। আমি আপনাদের সঙ্গে যাবো না। আপনারা খুব ভালো, আমার অনেক উপকার করলেন।

ছেলে তিনটি এবারে এগিয়ে গেল ব্যস্ত পায়ে। মিলা সেখানে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর হাঁটতে লাগলো উল্টো দিকে।

এক সময় প্রিয় তার কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করলে, কত?

মিলা বললো, কুড়ি টাকা দিতে চেয়েছিল। দশ নিয়েছি।

—আশ্চর্য তোমার ক্ষমতা মিলা। ভয় করেনি?

—সত্যি কথা বলতে আবার ভয় কি? একটাও কি মিথ্যে বলেছি? তবু, তোমার কাছে স্বীকার করছি, একটু একটু বুক কাঁপছিল। এই পৃথিবী নামের গ্রহটির মানুষদের বৈশিষ্ট্য কী জানো? এরা যে কে কী রকম হবে, তার কোনো ঠিক নেই। এক একজন খুব খারাপ, তারপরই একজন খুব ভালো। ছেলেরা যদি একসঙ্গে দু'-তিনজন থাকে, তাহলে মেয়েদের ব্যাপারে কী রকম লাজুক হয়ে যায়।

—আবার একসঙ্গে দু'তিনটি বদমাসও তো দল বেঁধে ঘোরে।

—আমি মুখ দেখে বুঝতে পারি। আমার কক্ষণো মানুষ চিনতে ভুল হয় না। চলো, এখন আমাদের অনেক পয়সা। আমরা প্রথমে পাও ভাজি খাবো। খুব ঝাল দিয়ে। তারপর এক গাদা চিনে বাদাম নিয়ে ময়দানে বসবো। যেই অন্ধকার হবে, অমনি জায়গাটা মনে হবে সমুদ্র।

—তোমায় আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে নিয়ে যাবো।

—কবে?

—আজই যেতে পারি। সন্ধেবেলার ট্রেনে যাবে? দীঘা কিংবা পুরী কিংবা গোয়া।

—সাঁতার কাটার পোশাক লাগবে না? এই পৃথিবীর মেয়েরা কিছু না পরে জলে নামে না।

—তুমি রাত্তির বেলা জলে নামবে। তোমার পোশাক লাগবে না।

—রাত্তিরে সমুদ্রে স্নান করতে নেই। দেবতাদের নিষেধ আছে।

—তাহলে চলো নিউ মার্কেট থেকে তোমায় এক ডজন সাঁতারের পোশাক কিনে দিচ্ছি।

—না। কেনা পোশাক আমার চাই না। স্নানের পোশাক আমি নিজে বানিয়ে নেবো, মাকড়সার জালের মতন সূক্ষ্ম সুতো দিয়ে। সেই জন্য

কয়েকদিন দেরি হবে। আর ট্রেনে তো যাবো না। যাবো আমাদের নিজস্ব একটা গাড়িতে।

—তা হলে তাই ঠিক রইলো। আগামী সপ্তাহে?

অনেকক্ষণ ময়দানে ওরা বসে রইলো রাত্রির আকাশের নিচে। আজ আকাশ পরিষ্কার, অনেক তারা উঠেছে যেন ওদের দু'জনের জন্য।

ময়দানে এ রকম সময় অনেক যুগলই বসে। কেউ কেউ লুকিয়ে চুরিয়ে একটু শরীর ছোঁয়াছুঁয়ি করে, কেউ কেউ বিনিময় করে দুঃখ। এরই মধ্যে ঘুরে যায় দালাল, ফড়ে, ছ্যাঁচোড়, পুলিশ, কিন্তু ওদের দুজনকে কেউ বিরক্ত করলো না।

মিলা বা প্রিয় কারুরই হাতে ঘড়ি নেই। তবু প্রিয় একসময় আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, এখন আটটা দশ বাজে।

মিলা বললো, না তুমি ভুল বলেছো। এখন আটটা পাঁচ। আরও পাঁচ মিনিট আমরা বসবো। তারপর এই পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবো। প্রিয়, তখন তুমি আমার হাত ধরে থেকো!

মিলার হাঁটুতে একটা ছোট চাপড় মেরে প্রিয় বললো, এই মিলা, তুমি ভুলে যাচ্ছো সব কথা। এখন তো আমাদের অদৃশ্য হয়ে যাবার কথা নয়। এখন তো আমরা এই পৃথিবীতে অজ্ঞাতবাসে আছি।

মিলা বললো, ও হ্যাঁ, তাই তো! কিন্তু আর কতদিন আমরা এরকম অজ্ঞাতবাসে থাকবো?

প্রিয় বললো, খুব বেশিদিন নয়। সময় হয়ে এলো। কেন মিলা, তোমার কি ওখানে থাকতে খুব অসুবিধা হচ্ছে? কেউ তোমায় কোনো কষ্ট দিচ্ছে?

মিলা কতক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, নাঃ! আমায় কষ্ট দেবে, এমন সাধ্য কার আছে? আমায় কেউ কষ্ট দিতে পারে না। কিন্তু, মাঝে মাঝেই আমার ভয় হয়, আমি বোধ হয় হারিয়ে যাবো, তোমায় আর খুঁজে পাবো না!

॥ ২ ॥

মিলার অজ্ঞাতবাসের জায়গাটা হচ্ছে যাদবপুরের বাঘাযতীন কলোনি। এখানে মিলার নাম উমা।

সেই কতকাল আগে উনিশশো ছাপান্ন সালের দাঙ্গার পর কৃপাসিন্ধু চক্রবর্তী সপরিবারে চলে এসেছিলেন মৈমনসিং থেকে। যাদবপুরের এদিকটায় তখন ছিল শুধু কয়েকটা বাগানবাড়ি, আর আগাছা ভরা মাঠ আর নোংরা

জল। সেখানেই এসে একদল ছন্নছাড়া মানুষ জবরদখল কলোনি বানিয়ে নিল। যার যেমন গায়ের জোর, সে তেমন জায়গা পেয়েছে, কৃপাসিন্ধু নিরীহ মানুষ, সেইজন্য তার জমি কম।

কৃপাসিন্ধুর দেশ ভাগের আগে ছিল পুরুতগিরি। বিদ্যে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত, তবু পুজোর মন্ত্র মুখস্থ ছিল অনেক এবং নিজের জন্মভূমিতে তার অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। এই বাংলায় পুরুতদের সমাদর নেই, ঐ পেশায় সারাবছর সংসার চালানো যায় না। কিন্তু কৃপাসিন্ধু আর কোনো কাজও জানে না। সুতরাং স্ত্রীর গায়ে যে কখানি গয়না ছিল তাই বেচে সে একটা জামা-কাপড়ের ছোটখাটো দোকান দিল যাদবপুর বাজারের কাছে।

সরল সাদাসিধে মানুষ ছিল তখন কৃপাসিন্ধু, সে ভেবেছিলো হাওড়ার মংলা হাট থেকে পাইকারি দরে কাপড়-চোপড় কিনে এনে প্রতি পিসে দু'-তিন টাকা লাভের হিসেব রেখে যাদবপুরের মানুষদের বিক্রি করবে। কিন্তু বামুন-পুরুতের পক্ষে এক পুরুষে ব্যবসায়ী হয়ে ওঠা অত সোজা নয়। একদিন দোকান বন্ধ করার সময় তিনটি সরল চেহারার ছেলে এসে জড়িত গলায় বললো, একশোটা টাকা ছাড়ো তো মাইরি!

এই তিনজনের মধ্যে দু'জনই কৃপাসিন্ধুর মুখ চেনা। আসা-যাওয়ার পথে প্রায়ই দেখেছে। বয়েসে ছেলেগুলো প্রায় তার ছেলে হবার যোগ্য, তবু তারা এই সুরে কথা বলে। সেই জন্য সে অবাক হয়ে বললো, কে রে। তোদের একশো টাকা দেব কেন!

ছেলেগুলো হেসে বললো, এমনিই দাও না! মাল খাবো!

কৃপাসিন্ধু বললো, তোরা তো বড় বেয়াদপ্। মানীর মান রেখে কথা বলতে জানিস না?

ছেলে তিনটি হেসে উঠলো।

পরদিন সকালে দেখা গেল কৃপাসিন্ধু পড়ে আছে নর্দমার ধারে মুখ গুঁজে। তারা সারা শরীর রক্তাক্ত। দোকানের ক্যাশবাক্স লোপাট।

কৃপাসিন্ধু কিন্তু বেঁচে উঠলো।

একে বামুন, তায় বাঙাল, সেই জন্যই সে যথেষ্ট গোঁয়ার। এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সে গেল পুলিশের কাছে।

পুলিশ তাকে মাসখানেক ধরে অনেক দলাই-মলাই করলো, তারপর নানা রকম মিষ্টি মিষ্টি কথার সঙ্গে সঙ্গে তাকে চেটে চুষে ছিবড়ে করে দিল একেবারে। তারপরেই তার দোকানে আগুন লাগলো একরাত্রে। একটুকরো সুতোও উদ্ধার করা গেল না।

সর্বস্বান্ত হওয়ার পর কৃপাসিন্ধু চক্রবর্তী মোটা মোটা হস্তাক্ষরে, বাংলা ভাষায় একখানা চিঠি লিখলো জওহরলাল নেহেরুকে। তাতে সে এ দেশের প্রধানমন্ত্রীকে সম্বোধন করলো, "দেশের মুখোজ্জ্বলকারী হে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা" বলে। এবং লিখলো, দেশ বিভক্ত হয়েছে আপনারই বিবেচনায়। জন্মভিটা ত্যাগ করে আমি এখানে এসে পড়েছি, কিন্তু কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না, বরং সকলেই অবজ্ঞা করে, এমনকি থানার দারোগা পর্যন্ত বলে, ওরে বাঙাল, যেখান থেকে এসেছিস, সেখানেই ফিরে যা না! এখানে কেন ভিড় বাড়াচ্ছিস! কিন্তু আমরা তো নিজের সাধে আসিনি। আপনি ও মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের কার্যাবলীর জন্যই তো আমাদের ভিটেমাটি সব গেছে। এদেশে আসার পর আমাদের জীবিকার কোন ব্যবস্থা আপনারা করেননি! তা হলে আমরা বাঁচি কী করে? নিজে সামান্য ব্যবসা শুরু করেছিলাম, তাতেও পদে পদে বাধা.....। এমতাবস্থায়, হে দেশের কর্ণধার, আপনি নিজে আসিয়া আমার দুরবস্থা দেখুন এবং সমুদয় বিবেচনা করিয়া আমার গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিন।

কৃপাসিন্ধুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই মর্মন্তুদ চিঠি পড়ামাত্র জওহরলাল দিল্লীর সমস্ত রাজকার্য ফেলে ছুটে আসবেন যাদবপুরের এই কলোনিতে। কৃপাসিন্ধুর কঁ্যাচার বেড়া দেওয়া ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে মহাত্মা গান্ধীর উত্তরাধিকারীটি বলবেন, পণ্ডিতমশাই, আমি এসে গেছি, আর আপনার চিন্তা নেই।

একমাস যায়, দু'মাস যায়, সে রকম কিছু ঘটে না, চিঠির উত্তরও আসে না। পাঁচ মাসের মাথায় কৃপাসিন্ধু পাগল হয়ে গেল। তার পাগলামির প্রধান লক্ষণ, মাঝে মাঝেই সে চেঁচিয়ে ওঠে। ঐ এসেছে! জওহরলাল এসেছে, এবার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

কৃপাসিন্ধুর বয়েস তখন আটত্রিশ, তার স্ত্রী ঊর্মিলার বয়েস ঊনত্রিশ। তখন তাদের চারটি সন্তান। একেবারে কনিষ্ঠা কন্যা উমা জন্মেছে মাত্র দেড় বছর আগে, এই কলোনিরই নতুন পরিবেশে।

সেই কতকাল আগে কবিরা লিখে গেছে যে হরিণীর শত্রু হলো তার নিজের গায়ের মাংস। ঊর্মিলার ক্ষেত্রেও সেটাই সত্যি হলো। ঊর্মিলার শরীরে রূপ ছিল। এমনকি চারটি সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও তার শরীর ভাঙেনি। ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট, স্বামী বায়ুরোগগ্রস্ত, সহায়-সম্বল কিছুই নেই। তাই ঊর্মিলাকে ঘর ছেড়ে বেরুতে হলো বাইরে। দর্জির দোকান ঘুরে ঘুরে সে ফ্রক আর প্যান্ট সেলাই করার ইজারা নেয়। তাতেই দিনে তিন-চার টাকা

রোজগার।

উর্মিলার পিতৃপরিবারও টাঙ্গাইল থেকে এলেও তারা কোনো জবরদখল কলোনিতে ওঠেনি। তারা বাড়ি ভাড়া করেছিল ভবানীপুরে। উর্মিলার দাদারা কৃপাসিন্ধুর মতন স্বাধীন ব্যবসার চেষ্টা না করে তারা নেমে এসেছিল চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায়। ক্রমে তারা সার্থক হয়েছিল। তাদের গায়ে রিফিউজির ছাপ পড়েনি, তারা তাদের বাঙাল পরিচয়ও মুছে ফেলেছিল খুব তাড়াতাড়ি। সেই জন্যই তারা গোড়ার দিকে তাদের কলোনি-বাসী আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সংস্রব রাখতে চায়নি। কিন্তু কৃপাসিন্ধু যখন উন্মাদ হলো, উর্মিলাকে পথে নামতে হলো, তখন কিছুটা টনক নড়লো উর্মিলার দাদাদের। তার বড়দা তখন ফুড ডিপার্টমেন্টের অফিসার। উপরি রোজগার আছে, নিউ আলিপুরে জমি কিনবে বলে ভাবছে। এহেন মানুষের বোন যদি উদ্বাস্তু কলোনিতে জামা সেলাই করে বেড়ায়, তাতে তার সামাজিক মর্যাদা ঠিক থাকে না। আসলে, টাকা-পয়সা রোজগার কিসের জন্য, সামাজিক মর্যাদার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার জন্যই তো।

উর্মিলার বড়দা সেই জন্যই এই সময়টাতে উর্মিলাকে কিছু সাহায্য করতে চাইলেন। বাঘাযতীন কলোনি ছেড়ে ভবানীপুরের বাড়িতে আধা-দাসী হওয়ার প্রস্তাব। বাপের বাড়ির তুলনায় স্বামীর সংসারে অভাব-অনটন অনেক বেশি থাকলেও উর্মিলার আত্মসম্মান জ্ঞান খুব টনটনে। চারটি ছেলেমেয়ে ও পাগল স্বামী নিয়ে সে দাদার সংসারে বোঝা হয়ে থাকতে চাইলো না।

উর্মিলা যদি নিজের মনের জোরে এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তার সংসারটিকে দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারতো, তা হলে চমৎকার একটা হাততালির ব্যাপার হতো। কিন্তু নিয়তি সবার গলায় ফুলের মালা দেয় না।

পুজোর আগে খুব কাজের চাপ। জামা-কাপড়ের বোঝা নিয়ে উর্মিলাকে ঘোরাঘুরি করতে হয়। প্রায়ই সন্ধে হয়ে যায়। একদিন জয়হিন্দ টেলারিং থেকে মাত্র রাত পৌনে নটার সময় কে বা কারা ধরে নিয়ে যায় উর্মিলাকে। উর্মিলার বড় ছেলে বিশ্বনাথের বয়েস তখন দশ। সে তার পরের বোন সীতাকে সঙ্গে নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত খুঁজলো মাকে পথে পথে। যারা উর্মিলাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, তারা কি জানতো এই শিশুদের কথা?

লকার মাঠে ভোর রাত্রে জ্ঞান ফেরে উর্মিলার। তার মুখ বাঁধা ছিল। হাত ও পা খোলা। তার ঠোঁটে, বুকে ও শরীরের অন্যান্য জায়গায় এমন কতকগুলো ক্ষত যে ঠিক মনে হয়, তাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে। এই

রকম অবস্থায় জ্ঞান ফেরার পর সে একটা মারাত্মক ভুল করলো।

শরীরে পান-বসন্ত হলেও সেরে ওঠার পর নিমপাতা আর হলুদবাটা মেশানো জলে স্নান করে নিষ্কলুষ হওয়া যায়। আর কুকুরে কামড়ানো দাগ ধুয়ে মুছে ফেলা যায় না? উর্মিলা সে চেষ্টাই করলো না। বোধ হয় ছেলে-মেয়েদের কথাও সে ভুলে গিয়েছিলো। লকার মাঠ থেকে আর বাড়ি না ফিরে সে পুকুরে ঝাঁপ দিল।

সেই জন্যই উমা বলে, সে মায়ের পেটে জন্মায়নি, সে আকাশ থেকে পড়েছে। মায়ের কোনো স্মৃতি নেই তার, মায়ের মুখখানা কেমন দেখতে ছিলো তাও সে জানে না।

আশ্চর্য এত কাণ্ডের পরও কিন্তু উন্মাদ কৃপাসিন্ধুর অসহায় ছেলেমেয়েরা না খেয়ে মরে গেল না। মরুভূমিতে যেমন কাঁটাগাছ বেঁচে থাকে অদম্য জীবনীশক্তিতে, সেই রকম ভাবে এরাও বেঁচে গেল। কলোনির লোকেরাও অবশ্য সেই সময় সাহায্য করেছিলো কিছুটা। বছর দু'-এক বাদে কৃপাসিন্ধু আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠলো, পাগলামি পুরোপুরি না সারলেও ফিরে এলো খানিকটা দায়িত্বজ্ঞান। তখন জয়গুরু ভাণ্ডারের মালিক রাধিকাবাবু দয়াবশতঃ কৃপাসিন্ধুকে একটি চাকরি দিলেন নিজের দোকানে। সে চাল-ডাল-তেল-নুন ওজন করে এবং এই কাজটি বেশ মন দিয়ে করে। খদ্দেররা কিন্তু এখনও তাকে ডাকে পুরুতমশাই বলে। পাড়ার বারোয়ারি পুজোয় এখনো কৃপাসিন্ধুর ডাক পড়ে, তাতে তার দু'পয়সা বাড়তি রোজগার হয়। তাছাড়া রাধিকাবাবু বলে দিয়েছেন, তিনি যতদিন বাঁচবেন, ততদিন কৃপাসিন্ধুর ছেলেমেয়েদের খাওয়া-পরার কোনো কষ্ট হবে না।

কলোনির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই ধুলোকাদা মেখে বড় হয়ে উঠেছে উমা। সে যে সকলের চেয়ে একটু আলাদা, তা অবশ্য কারুর চোখে পড়েনি।

চার ভাইবোনের মধ্যে বড় ভাই বিশ্বনাথকে ছেলেবেলা থেকেই অনেক দায়িত্ব নিতে হয়েছে বলে তার লেখাপড়া হয়নি। বাবার মতনই সে নিরীহ। সে-ও কাজ করে একটি ওষুধের দোকানে। এর মধ্যে বিয়ে করে একটি মুখরা স্ত্রী এনেছে। তিনটি বাচ্চাও জন্মে গেছে। গীতারও লেখাপড়া শেখা হয়নি, তার বিয়েও হয়নি। সে কাজ করে একটা সুতো কারখানায়। প্রায়ই সে কারখানা বন্ধ থাকে। ছোট দু' ভাইবোন ধনঞ্জয় আর উমা দু'জনেই ইস্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল, তারপর ধনঞ্জয় হয়ে গেল দুর্ধর্ষ নকশাল, শুধু বাঘাযতীন কলোনি কেন, গোটা যাদবপুর তার নামে কাঁপতো। অনেকদিন সে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ছিল, তারপর তাকে ধরিয়ে

দিল তারই দলত্যাগী বন্ধুরা।

যখন সব নকশাল ছেলেরা ছাড়া পেয়ে গেল, তখনও কিন্তু ধনঞ্জয় ফিরলো না বাড়িতে। তার খবর কেউ জানে না, কেউ বলে সে জেল থেকে পালিয়েছিল, কেউ বলে তার অন্য কিছু হয়েছে। উমাদের অবশ্য ধারণা, কোনো কারণে এখনো কোথাও লুকিয়ে আছে ধনঞ্জয়। একদিন না একদিন সে ফিরে আসবেই। সে আসবে বীরের মতন, পদভারে দুনিয়া কাঁপিয়ে।

এইসব ডামাডোলে উমার আর কলেজে পড়া হয়নি। অবশ্য তাকে কলেজে পাঠাবার কথা উচ্চারণও করেনি কেউ। উমার স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট এমন কিছু আহামরি নয়, তাকে কেউ বিনাপয়সায় পড়াবে না।

এইরকম অবস্থায় যা হয়, উমার জন্য বিয়ের পাত্র খোঁজা হচ্ছে কয়েক বছর ধরে। যেহেতু তার চেহারায় একটা জেল্লা আছে, তাই বিয়ের বাজারে তাকে নিয়ে দর কষাকষি করা যায়। সেরকম কিছু এখনো হয়নি অবশ্য। তার আগে, পাড়ায় প্রাইমারি স্কুলে একটা চাকরিরও চেষ্টা হচ্ছে উমার। একটা পোস্ট খালি হলেই সে পাবে এ রকম কথা আছে।

সকালবেলা জলভরা টিনের বালতিতে ন্যাতা ডুবিয়ে ডুবিয়ে উমা ঘর মোছে। তার ডুরে শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ানো। হাঁটুতে ভর দিয়ে সে তার বাবার খাটের তলা থেকেও ধুলো টেনে আনে।

ঘর মোছা শেষ হলে সে আসে বারান্দায়। বারান্দায় সিমেন্টের অনেক জায়গায় চল্‌টা উঠে গেছে, সেখানে জল পড়লেই মাটি উঠে আসে। একদিন সেখানে সে একটা কেঁচোও দেখেছিল।

উমাদের উঠোনের পাশ দিয়েই এই কলোনির লোকদের যাওয়া-আসার পথ। অনেকেই যেতে যেতে উমার দিকে ফিরে ফিরে দেখে। সোজাসুজি নয়, আড়চোখে। উমা কারুকে গ্রাহ্য করে না।

এখানকার পরিবেশ আর আগের মতন নেই। নক্‌শাল আন্দোলনের পর অবস্থা অনেক বদলে গেছে। এখন আর রাত পৌনে ন'টার সময় কেউ এ পাড়ার কোনো যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে লকার মাঠে ফেলে রাখার সাহস পায় না। উঠতি মাস্তানদের পাড়ার রাজনৈতিক ছেলেরাই শায়েস্তা করে দেয়। মাস্তানরা অন্য পাড়ায় গিয়ে কাজ-কারবার চালায়, নিজেদের পাড়ায় শান্তি থাকে।

উমা কারুর সঙ্গে মেশে না। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় কেউ তাকে আওয়াজ দিতে সাহস করে না; কারণ সে ধনঞ্জয়ের বোন, যে-ধনঞ্জয় যে-কোনো

দিন ফিরে আসতে পারে!

বারান্দা মুছতে মুছতে উমা এক একবার ঘাড় কাৎ করে আকাশের দিকে তাকায়। ফিক ফিক করে হাসে।

যে কেউ এসময় দেখলে ভাববে উমা বুঝি পাগল।

উমা এই সময় আর উমা থাকে না। সে মিলা হয়ে যায়। যেন সে আকাশের কারুর উদ্দেশে এই সময় বলতে চায়, দ্যাখো, আমি এখানে কী রকম নিখুঁত ছদ্মবেশ ধরে আছি।

॥ ৩ ॥

এবারে প্রিয়র ছদ্মবেশটা দেখা যাক।

প্রিয়র অন্য কোনো নাম নেই, সে থাকে কাচ-ফ্যাক্টরির পেছনে। এটাও একটা জবর-দখল কলোনি। কিন্তু এর নাম নেই। কাচ-ফ্যাক্টরির নামেই এর পরিচয়।

প্রিয়র বাবা নেই, মা আছে। আরও তিনটি ভাই-বোন আছে। তার মৃত দাদার স্ত্রী ও দুটি বাচ্চাও আছে।

প্রিয় সোনারপুরে একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। মাইনে যাই হোক, তাও প্রত্যেক মাসে ঠিক সময়ে পাওয়া যায় না। তবে এই চাকরিতে একটা খুব সুখ, প্রায়ই ছুটি থাকে।

প্রিয় তার পাড়ায় খুব দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে পরিচিত। সকালবেলা সে বাজারে যায়। সে নিজের হাতে বাজার করে একটা কারণে, প্রত্যেক দিন ঠিক দু'টাকার মধ্যে বাজার করে সারা সংসারকে মোটামুটি খুশি রাখার মন্ত্র একমাত্র সে-ই জানে।

সে যখন বাজারের থলি হাতে বেরোয়, তখন প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে এক বাড়ির মাসি কিংবা অন্য বাড়ির বৌদি তাকে ডেকে বলে ও প্রিয়, আমার জন্য ক'খানা সজনে ডাঁটা আনিস! কিংবা ও প্রিয়, আড়াইশো ইচা মাছ আনতে পারবি আমার জন্য?

প্রিয় সবাইকে হাসি মুখে ঘাড় নাড়ে। এনেও দেয় এসব জিনিস। এসব কিছুর জন্য সে দাম নেয় বটে, কিন্তু সবাই জানে, সে এক পয়সাও বেশি নেবে না। কিংবা আড়াইশো কুচো চিংড়ির নাম করে দুশো চালিয়ে দেবে না।

পাড়ার সিগারেটের দোকানে প্রিয় ধার পায়।

সে চায়ের দোকানে ঢুকলে প্রায় দিনই কেউ না কেউ তার চায়ের

দাম দিয়ে দেয়।

সে বাসে উঠলে অনেক সময়ই তার পাড়ার কোনো ছেলে নিজের সিট ছেড়ে দিয়ে ডাকে, ও প্রিয়দা, এই যে, এখানে এসে বসুন!

এর বিনিময়ে সে অনেকেরই চাকরির দরখাস্ত লিখে দেয়। মানি অর্ডার ফর্ম ভরে দেয়। এমনকি কয়েকজনের জন্য তো থানাতেও গিয়ে দরবার করেছে।

প্রিয় এ পাড়ার হীরের টুকরো ছেলে, কিন্তু জীবনে তার তথাকথিত কোনো সাফল্য আসেনি বলে পাড়ার সবাই তাকে করুণা করে। তার প্রসঙ্গ এলে অনেকেই জিভে চুক চুক শব্দ করে বলে, আহা অমন ভালো মানুষটার কিছু হলো না! গুন্ডা ও মাস্তানরাও বলে, শালা, প্রিয় শালার মিনিস্টার হওয়া উচিত ছিল মাইরি।

বি. এ. পরীক্ষায় অনার্স পায়নি প্রিয়। পাস কোর্সের গ্রাজুয়েট আর স্কুল ফাইনালের কোনোই তফাত নেই। উচ্চশিক্ষা কিংবা উচ্চ চাকরি দুটোর পথই তার কাছে বন্ধ, সে কোনো রাজনৈতিক দলেও ঢোকেনি।

বাড়িতে কিংবা পাড়ার মধ্যে সে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ প্রিয় এইরকম শান্ত ও ভদ্র সেজে থাকে। সে প্রায় সব সময় মনে মনে বলে, তাকে শান্ত থাকতে হবে, তার মাথা গরম করলে চলবে না। তার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরির অনিয়মিত রোজগারের ওপরেই তাদের পরিবারের এতগুলো মানুষ নির্ভরশীল, সামান্য একটু ভারসাম্য নষ্ট হলেই সব ভেঙে পড়বে।

প্রিয় তবু যে একেবারে একটি যন্ত্রে পরিণত হয়নি, তার কারণ সে জানে এটা তার অজ্ঞাতবাস। অর্জুন অজ্ঞাতবাসের সময় হিজরেড় পর্যন্ত সাজতে পেরেছিল আর সে একজন দুঃস্থ স্কুলমাস্টার সেজে কিছুদিন থাকতে পারবে না? তার তো অন্য সাম্রাজ্য আছেই।

সোনারপুরে যে স্কুলটায় সে পড়ায় সেখানে প্রত্যেকদিনই একটা না একটা গোলমাল। যে-কোনো বাঙালি প্রতিষ্ঠানের মতনই সেখানেও শিক্ষকদের মধ্যে তিনটি দল। সার্কাসে যারা তারের খেলা দেখায়, তাদেরই মতন অত্যন্ত কৌশলে প্রিয় এই তিন দলের মাঝখান দিয়ে হাঁটে। কারুকে চটায় না। আবার কারুর কথা শুনতেও রাজি হয় না।

স্কুলের হেডমাস্টার প্রিয়র এই ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। এই হেডমাস্টারও একজন ছদ্মবেশী। ইনি ছদ্মবেশে ডিটেকটিভ গল্প লেখেন। হেডমাস্টার হিসেবে এঁর নাম গোবিন্দচন্দ্র বড়াল হলেও রহস্য কাহিনীর জগতে ইতি সত্যময় বর্মণ।

এঁর লেখা চটি চটি রহস্য কাহিনী বিক্রি হয় অনেক রেল স্টেশনে। সে সব বইয়ের মলাটে থাকে, এক মুখোসধারীর হাতের পিস্তলের নল এক জামা-ছেঁড়া যুবতীর স্তনে ঠেকে আছে।

গোবিন্দবাবু একদিন ছুটির পর বললেন, প্রিয় তোমার কোনো কাজ আছে আজ ?

প্রিয় তার স্বভাবসুলভ শান্ত, নিরীহ ভঙ্গিতে বললো, আজ্ঞে না স্যার।

—তাহলে চলো, আমার বাড়ি চলো। তোমার সঙ্গে একটু কাজের কথা আছে। যাবে ?

—চলুন স্যার।

গোবিন্দচন্দ্র বড়াল মশাইয়ের বাড়ি নিউ ব্যারাকপুর। সোনারপুর থেকে ট্রেনে শিয়ালদা, সেখান থেকে আবার ট্রেন। সব মিলিয়ে ঘণ্টা দুয়েক লাগে।

প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টারের তুলনায় এঁর বাড়ি বেশ বড়। অবশ্য রহস্য কাহিনী রচনাই এই সমৃদ্ধির কারণ নয়, এঁদের যৌথ পরিবার, এবং চাকরি ছাড়াও ধানজমি টমি আছে।

বাড়িটি দোতলা, সামনে লঙ্কার খেত। গোবিন্দচন্দ্র বর্তমানে বিপত্নীক, সংসারের কর্তা তাঁর দাদা।

গোবিন্দচন্দ্র প্রিয়কে ওপরের ঘরে এনে বসালেন। অন্ধকার হয়ে এসেছে, এ পাড়ার বিজলিবাতির এখন মুখ অন্ধকার, তাই জ্বালা হলো একটা হ্যারিকেন। গোবিন্দচন্দ্র বাড়ি ফিরে মুড়ি সহযোগে চা খান, প্রিয়কেও তা খাওয়ালেন। প্রিয়র বাড়ির কুশল জিজ্ঞেস করলেন।

তারপর বললেন, হ্যাঁ, এবার তাহলে কাজের কথাটা বলা যাক। দ্যাখো, ভাই, তুমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, আমিও তাই। সেইজন্য আমরা দুজনে যদি দু'জনকে সাহায্য না করি, তাহলে আর কে করবে বলো ? ঠিক কি না ?

প্রিয় বললো, ঠিক।

—এবারে বলো তো, আমি তোমায় কোন্ সাহায্য করতে পারি ? বেশ ভালো করে ভেবে বলো।

প্রিয় ঘাড় চুলকোলো, ঘরের ছাদ দেখলো, হ্যারিকেনের আলোর দিকে চোখ রাখলো, তবু তার কোনো প্রয়োজনের কথাই মনে পড়লো না।

সে বললো, স্যার, সে রকম তো ঠিক...। তার চেয়ে আপনাকে যদি আমি কিছু সাহায্য করতে পারি আমার সামান্য শক্তি দিয়ে...

—তোমার এখন মনে পড়ছে না ? আমি একটু ধরিয়ে দিই ? আমাদের স্কুলে শিগ্গিরই একটা লিভ ভ্যাকেন্সি হচ্ছে, তোমার যদি কোন ভাই

থাকে...তবে হ্যাঁ, জেনুইন ভাই হওয়া চাই, পাড়ার ছেলে টেলে হলে চলবে না। এমনকি পিসতুতো-মাসতুতো হলেও আমি অ্যালাউ করবো না!

—আজ্ঞে আমার নিজের ভাই তো এখনও স্কুল ফাইনাল পাশ করেনি!

—তবে তো মুশকিল। তবে অন্য কিছু ভাবো।

—ভাববো নিশ্চয়! এখন যদি আপনার কোনো প্রয়োজনের কথা বলেন!

—হ্যাঁ বলছি।

উঠে গিয়ে তিনি টেবিলের দেরাজ খুলে একতাড়া কাগজ বার করলেন। অন্তত পাঁচশোটি খোলা পাতা। সেই তাড়াটি প্রিয়র সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, এটা পড়ো, তা হলেই বুঝবে! এ কিন্তু শুধু তোমাকেই বললুম, আমাদের স্কুলের আর কাক-পক্ষীটিও কিছু জানে না। পড়ো। জোরে জোরে পড়ো।

প্রিয় দেখলো, প্রথম পাতার ওপরে বড়ো বড়ো করে লেখা "দুঃশাসনের রক্তপাত।" কিন্তু তারপরে মূল লেখা এমনই জড়ানো যেন মনে হয় কালিমাখা পায়ে পিঁপড়ে হেঁটে গেছে। ঐ রকম হাতের লেখা, তার ওপর আবার হ্যারিকেনটা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

প্রিয় বললো, স্যার, আমি এর কিছুই পড়তে পারছি না।

গোবিন্দচন্দ্র বললেন, সেইটাই তো আমার সমস্যা। রহস্য সাহিত্যে আমি ক্লাসিক রচনা করছি, অথচ বড় বড় কাগজের সম্পাদকরা তা না পড়েই ফেরত দেয়। পড়তেই পারে না কেউ। আমার যে মোটে তিনটি গল্প মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তা আমার ভাইপো শিবু লিখে দিয়েছে। না, না, সে নিজে লিখে দেয়নি, শুধু কপি করে দিয়েছে। আমি নিজের পয়সায় বই ছাপি। প্রেসের লোক আমার হাতের লেখা ঠিক পড়ে নেয়। কিন্তু মাসিক কাগজের সম্পাদকরা সব ফুল-বাবু, তারা দামি কাগজে মুক্তোর মতন হাতের লেখা না হলে পাতা উল্টেই দেখবে না। এখন গত মাসে শিবু একটা চাকরি পেয়ে দুর্গাপুরে চলে গেল। তা হলে আমার কী উপায় হবে? এত কষ্ট করে যেটা লিখলুম, সেটা সাহিত্যের পাঠকরা পড়বে না?

—আমি কী করে আপনাকে সাহায্য করবো, স্যার?

—তুমি ব্রাদার, এটা শুধু কপি করে দেবে। এটুকু উপকার তোমার কাছ থেকে পাবো না? নির্ঝঞ্ঝাট লোককে আর এক নির্ঝঞ্ঝাট লোক না দেখলে আর কে দেখবে বলো?

—কিন্তু স্যার, যে লেখা আমি পড়তে পারি না তা আমি কী করে কপি করবো?

—সেটা তো অতি সোজা। আগে তুমি রাজি আছো কি না বলো।

—হ্যাঁ। তা রাজি হবো না কেন? যদি আপনার এইটুকু উপকার করতে পারি—

—ব্যস, ব্যস, তা হলেই হলো। রাজি হওয়াটাই বড়ো কথা। কপি করা তো অতি সোজা কাজ। আমি পড়ে পড়ে বলে যাবো, তুমি লিখে যাবে। মনে করো, আমি ব্যাসদেব আর তুমি গণেশ ঠাকুর। হা-হা-হা!

—আপনি পড়ে পড়ে বলে যাবেন?

—হ্যাঁ! ছুটির দিনে তুমি দুপুরবেলা আমার বাড়িতে চলে আসবে। এই তো, সামনেই পুজো ভ্যাকেশন। তখন তো তোমার কোনো কাজ নেই। দুপুরবেলা তুমি চলে আসবে, খাওয়া-দাওয়া করে। আমার তখন একটু গড়ানো অভ্যেস। আমি শুয়ে শুয়ে পড়ে যাবো, আর তুমি লিখে যাবে। কেমন, খুব সোজা কাজ নয়?

—ছুটির দিনে দুপুরবেলা, আপনার এখানে চলে আসবো?

—হ্যাঁ! এই ধরো দুটো-আড়াইটের মধ্যে!

প্রিয় বেশ খানিকটা দমে গেল। তার অজ্ঞাতবাস ও ছদ্মবেশে এতখানি আত্মত্যাগ কি সম্ভব? ছুটির দুপুরগুলো এরকমভাবে নষ্ট করা। তাছাড়া ট্রেনের ভাড়াই বা কে দেবে?

ছুটির দিনে অন্যদের কোনো কাজ থাকে না, কিন্তু প্রিয় যে ছুটির দিনগুলিতেই সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে। বাড়ি থেকে ছুটি নিয়ে সে তখন তার ছদ্মবেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। সে তখন অন্য মানুষ। রাজকুমারী মিলার দেহরক্ষী। তার মুখচোখের চেহারাই তখন আলাদা।

ছুটির সময় প্রিয় কিছুতেই এভাবে নষ্ট করতে পারবে না।

কিন্তু মুখ গোঁজ করে থাকলে চলবে না। প্রিয় হাসি মুখে বললো, নিশ্চয় নিশ্চয়ই! তা হলে তো আমার সন্ধেগুলো ভালোই কাটবে।

গোবিন্দচন্দ্র আরও উৎসাহিত হয়ে বললেন, তা হলে তুমি রাজি! বা, বা, বা! জানতুম, আগেই জানতুম! তুমি অতি সজ্জন। পরোপকারী। বাংলা সাহিত্যের তুমি কত উপকার করবে ভেবে দ্যাখো।

এরকম কিছু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার পর গোবিন্দচন্দ্র প্রস্তাব দিলেন, তবে তো শুভস্য শীঘ্রং করলেই হয়। আজ থেকেই শুরু করা যাক না। আমি পড়তে শুরু করি—

প্রিয় বললো, আজ থেকেই! তা মন্দ কী! প্রথম দিনটায় আপনি বরং পড়ে যান। আমি শুনি। গল্পটা আগে থেকে কিছুটা জানা থাকলে—

গোবিন্দচন্দ্র পড়তে শুরু করলেন আর প্রিয় উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইলো তাঁর মুখের দিকে।

মানুষ চোখের পাতা বন্ধ করতে পারে কিন্তু কান বন্ধ করতে পারে না। অবশ্য কান খোলা রাখলেই যে সব কিছু শুনতেই হবে, তারও কোনো মানে নেই। ঘুমের সময়ও তো কান খোলা থাকে, তখন কি সব শব্দ শোনা যায়!

ঘুমের চেয়েও এক গভীরতর অন্যমনস্কতায় প্রিয় ডুবে রইলো। গোবিন্দচন্দ্রের রহস্য কাহিনী তার মাথায় একটুও ঢুকলো না।

সাড়ে ন'টা আন্দাজ সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে প্রিয় প্রায় দৌড়তে দৌড়তে চলে এলো রেল স্টেশনে। আর নাকি একটাই ট্রেন বাকি আছে।

রেলের প্ল্যাটফর্মটা প্রায় ফাঁকা। সেখানে পায়চারি করতে করতে প্রিয় মাঝে মাঝেই থমকে গিয়ে দেখতে লাগলো আকাশ। আজ মেঘ নেই। অনেক গ্রহ নক্ষত্র ঝলমল করছে। প্রিয় মনে মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, ইচ্ছে করলেই যে-কোনো দিন আমি আমার নিজস্ব গৃহে ফিরে যেতে পারি। এখানে শুধু কয়েকদিনের খেলা চলছে। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার সেজে থাকার এই খেলাটা এমন কিছু খারাপ তো নয়!

প্রিয়র সঙ্গে মিলার যখন তখন দেখা হবার কোনো সুযোগ নেই! এই সব অঞ্চলে এক কলোনির ছেলে অন্য কলোনির মেয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে না। পুলিশের চেয়েও কড়া এক শাসন ব্যবস্থা চালু রেখেছে পাড়ার ছেলেরা। কে কোথায় যায়। কার সঙ্গে কার দেখা হয়, কোন্ বাড়িতে কার বেশি যাতায়াত সব এরা জানে। একটু মাত্রা ছাড়ালেই এরা চেপে ধরবে।

যে সব দিনে প্রিয়র স্কুল ছুটি থাকে সেই সব দিনে মিলা যায় চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। কলোনি থেকে বেরিয়ে সে যখন বাস স্টপে দাঁড়ায় তখন অনেকগুলি চোখ তাকে লক্ষ্য করে। যতক্ষণ বাস না আসে, ততক্ষণ সে মিলা নয় উমা। কিছু একটা আছে তার চেহারা ও ব্যবহারে যে জন্য কেউ তাকে এ সময় বিরক্ত করতে সাহস পায় না।

তা ছাড়া দিনকাল পাল্টে গেছে। এদিকে এখন অনেক মানুষের বসতি। গরিব ঘরের অনেক ছেলেমেয়েও যথেষ্ট লেখাপড়া শিখছে। মেয়েদের পক্ষে চলা-ফেরা করার কোনো বাধা নেই।

সত্যি সত্যি চাকরির ইন্টারভিউ কোনো-দিন থাকে, কোনো-দিন থাকে না। সে যাই হোক না কেন, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটা বকুল গাছের

নিচে দুপুর তিনটার সময় প্রিয়র সঙ্গে ঠিক দেখা হবেই। দুপুরের দিকে এই যে দেখা হয় দুজনে, অমনি ছদ্মবেশ খসে যায়। চোখেমুখে অন্য জগতের দীপ্তি। প্রিয় মিলার একটা হাত ছুঁয়ে দিতেই ঝনঝন করে ওঠে দু'জনের শরীর। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসে। সে রকম হাসি তো পৃথিবীর মানুষ হাসতে জানে না।

প্রিয় দারুণ উল্লাসে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, চলো আজ আমরা দারুণ বড়লোক সাজবো!

মিলা বললো, মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে যে সাদা রঙের বাগানবাড়িটা আছে, তুমি ওটা কিনে দেবে আমার জন্যে?

প্রিয় বললো, হ্যাঁ, এক্ষুণি। ওর আর কত দাম। আমি তো তোমাকে গঙ্গা নদীটাই কিনে দেবো ভাবছিলুম। মিলার মুখে ফুটে উঠলো বালিকার খুশি। হাততালি দিয়ে সে বললো, গঙ্গা নদী! দারুণ! আমার তাহলে সেটাই চাই। এক্ষুণি।

—চলো!

—প্লেনে করে যাওয়া যায় না?

—তার চেয়ে মনোরথ তারও তাড়াতাড়ি যাবে। আমার হাতটা ধরে চোখ বন্ধ করো, পৌঁছে যাবো এক্ষুণি।

এই দুপুরে গঙ্গার ধার যতটা নির্জন থাকার কথা ছিল, ততটা নির্জন নেই। কিছু মানুষজন ঘুরছে।

প্রিয় তাদের গ্রাহ্য করলো না। বাবুঘাটের সিঁড়ি দিয়ে একেবারে নেমে এলো জলের ধারে। মিলার হাতটা জলে ডুবিয়ে দিয়ে সে বললো, এই নাও, আজ থেকে এই নদীটা আমি তোমায় দিয়ে দিলাম।

—এত বড় নদীর সবটা?

—হ্যাঁ সবটা! তুমি খুশি হয়েছো?

—দারুণ। এই যে সব নৌকো আর স্টিমার যাচ্ছে, ওরা এরপর থেকে আমার অনুমতি নেবে?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে ওরা জানে, তুমি খুব দয়াবতী, তুমি কারুকে নিষেধ করবে না।

—নদীর ওপরে নৌকো না থাকলে মানায় না।

—বাংলাদেশ থেকে গঙ্গার জলের কিছুটা ভাগ চেয়েছে, তুমি ওদের দেবে তো?

—কেন দেবো না? ওদের যতটা দরকার নিয়ে নিক। আচ্ছা, ঐ যে

আধখানা ব্রিজ গঙ্গার ওপরে হুমড়ি খেয়ে আছে, ওটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। ওটাকে চটপট শেষ করতে বলো।

—এবারে তুমি হুকুম দিলেই খুব তাড়াতাড়ি কাজ হবে।

কাছেই একটা নৌকোর ওপরে লুঙ্গি পরা একটি কিশোর মাঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল। মিলা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে।

ছেলেটি নৌকো নিয়ে কাছে আসতেই মিলা জিজ্ঞেস করলো, এই তোমার নাম কি?

ছেলেটি বললো, আকবর।

মিলা বললো, বাঃ কী সুন্দর নাম। তুমি ছদ্মবেশে আছো, তাই না? আগে বাদশা ছিলে এখন মাঝি হয়েছো। আকবর মাঝি, তুমি আমাদের সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে যাবে? আমি একটু মোহনাটা দেখে আসবো। আমার নদীর কোনো কষ্ট হচ্ছে কি না সেখানে, তাও তো আমার দেখতে হবে!

ছেলেটি এ সব কিছু বুঝলো না। সে ব্যবসায়ীর মতন গলায় বললো, ঘুরতে যাবেন? ঘণ্টা দশ টাকা।

মিলা প্রিয়র মুখের দিকে তাকালো।

প্রিয় মুচকি হেসে বললো, এ তোমায় চিনতে পারেনি। তাই টাকা চাইছে। জানো তো, সম্রাট হারুন-আল-রশিদ বাগদাদের রাস্তা দিয়ে রাত্রি বেলায় ছদ্মবেশে ঘুরছিলেন। একজন সিপাহি এসে তাঁর কাছে পয়সা চাইলো। সম্রাট কিন্তু তার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন না, পয়সা দিয়ে দিলেন।

মিলা বললো, তুমি ওকে আমার পরিচয়টা দিয়ে দাও। আমার নদীতে আমি ঘুরবো। প্রথম দিনেই পয়সা দেবো কেন?

প্রিয় বললো, ঠিক বলেছো! এক্ষুণি বলে দিচ্ছি।

প্রিয় একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ সরু করে আকবরের দিকে তাকালো। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, এই খোকা, তোর কাছে পোর্ট-কমিশনারের লাইসেন্স আছে?

এর মধ্যে লাইসেন্স কথাটি ছেলেটি বোঝে। তার মুখটা একটু শুকিয়ে গেল। সে বললো, বাবু, আমরা তো হলদিয়া থেকে এসেছি।

—হলদিয়া থেকে এসেছিস তো, এখানে নৌকো ভাড়া খাটাচ্ছিস কেন? পুলিশে ধরবে যে, তোর বাবা কোথায়? আর বড় কেউ নেই তোর নৌকোয়?

—বাবা বাজারে গেছে।

—এই যে দিদিমণিকে দেখছিস, আজ থেকে এই দিদিমণি পোর্ট কমিশনারের চেয়ারম্যান বুঝলি? এই দিদিমণি ইচ্ছে করলে তোদের জেলে

দিতে পারে, আবার ছেড়েও দিতে পারে।

মিলা বললো, না না জেলে দেব কেন ? তা ছাড়া সব জেলখানা ভর্তি। কোথাও আর জায়গা নেই।

আকবর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, চাচা, ও চাচা !

এবারে ঘাটের পাশ থেকে এগিয়ে এলো আর একজন লোক। লুঙ্গি পুরা, খালি গা, বেশ বলশালী চেহারা, মুখে একটা নিমড়ালের দাঁতন। এই বিকেল বেলা লোকটি দাঁত মাজছে কেন কে জানে ?

লোকটি বেশ কুটিল ভাবে তাকালো ওদের দিকে।

প্রিয় কিন্তু একটুও ঘাবড়ে গেল না। সে আকবরকে জিজ্ঞেস করলো, এই তোমার চাচা ? এর নাম কী ?

—আব্বাস। ও চাচা, এই বাবু আমায় ভয় দেখাচ্ছে।

প্রিয় হাসিমুখে লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, আব্বাস মিঞা আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

তারপর দু'মিনিট ধরে সে লোকটির কানের কাছে ফিস্‌ফিস করে কী যেন সব বলে গেল।

লোকটির মুখের রাগ রাগ ভাব বদলে গাম্ভীর্য এলো, তারপর এক সময় হাসি ফুটলো।

সে গলা চড়িয়ে বললো, এ আকবর, যা তোর নৌকায় বাবু আর দিদিমণিকে নিয়ে যা, এনারা যতদূর যেতে চান, ঘুরিয়ে নিয়ে আয়।

প্রিয় ফিরে এসে মিলার হাত ধরে বললো, চলো। তোমার নৌকো প্রস্তুত।

মিলা জিজ্ঞেস করলো, তুমি লোকটিকে কি বললে ?

—ও তোমায় মহারানী বলে চিনতে পেরেছে।

—বলো না। কী বললে ওকে ?

—লোকটি ভেবেছিল, তুমি ইন্দিরা গান্ধীর মেয়ে। আমি ওর ভুল শুধরে দিলুম। আমি বললুম, ইন্দিরা গান্ধীর কোনো মেয়েই নেই। ইনি হচ্ছে মহারানী। এক সময় গঙ্গা নদীর ইজারা ছিল রানী রাসমণির, এখন মহারানী মিলার।

—তবে যে আমায় দিদিমণি বললো ?

—আমিই তো ওকে বারণ করে দিয়েছি। তোমার আসল পরিচয়টা যেন সবাইকে জানিয়ে না দেয়।

দু'জনে নৌকায় উঠবার পর প্রিয় বললো, তুমি ইচ্ছে করলে জলে

পা ডুবিয়ে বসতে পারো। তোমার এ নদীতে হাঙর কুমীর নেই। বসে বসে দেখো, আমি কেমন নৌকো চালাই। এই আকবর, আমায় বৈঠা দে আর তুই হালটা ধর।

—তুমি নৌকো চালাতে পারো? কী করে শিখলে?

—আমার এক পূর্বপুরুষ পর্তুগীজ বোম্বেটের সঙ্গে লড়েছিল। সুতরাং আমার রক্তেই আছে।

—এখন এই নদীতে বোম্বেটে আসে না?

—হ্যাঁ আসে। অন্যরকম ছদ্মবেশে আছে। তাছাড়া, এই দেশের মধ্যে তো কত রকম বোম্বেটে লুকিয়ে আছে।

প্রিয় জন্মেছে যাদবপুরে, কোনোদিন পূর্ববঙ্গ সে চোখেও দেখেনি, কোনোদিন সে নৌকোও চালায়নি। তবু বোধহয় সত্যিই কিছু একটা রক্তের ব্যাপার আছে। বৈঠা হাতে নেবার পর সে বেশ দক্ষতাই দেখাতে লাগলো। আকবরও একটু অবাক হয়ে গেছে। সে ফস্ করে একটা বিড়ি ধরালো।

মিলা বললো, ওমা দেখেছো, এইটুকু ছেলে বিড়ি খায়!

প্রিয় বললো, এইটুকু কী বলছো, মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেছে। এই আকবর, তোর বয়েস কত রে?

—চোদ্দ।

—তবে, চোদ্দ বছরের ছেলে একলা নৌকো চালাতে পারে। তাহলে নিশ্চয়ই ওর বিড়ি খাওয়ার অধিকার আছে। এই আকবর, আমায় একটা বিড়ি দিবি?

আকবর বিড়ি সমেত টিনের কৌটো আর কেরোসিন তেলের লাইটার এগিয়ে দেয়।

মিলা বললো, তাহলে আমিও একটা বিড়ি খাবো!

প্রিয় বললো, ছিঃ। অমন কথা বলে না।

—কেন ছিঃ। ছেলেরা বিড়ি-সিগারেট খেতে পারলে মেয়েরা কেন পারবে না?

আকবরও ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে। মিলার কথাটা তারও পছন্দ হয়নি।

প্রিয় বললো, আমি সেজন্য বলছি না। তোমার ঐ নরম পাতলা ঠোঁট, ও কি বিড়ি খাওয়ার যোগ্য? তোমাকে আমি ইজিপসিয়ান সিগারেট কিনে দেবো। কিংবা মোঘল সম্রাজ্ঞীদের মতন তুমি আলবোলার নল ছোঁয়াবে ঐ ঠোঁটে।

মিলা হাত বাড়িয়ে বললো, দাও?

—কী ?

—তোমারটা থেকে একটান দিয়ে দেখবো।

আকবর বললো, আপনারা ছই-এর মধ্যে যেতে পারেন। আমি ঠিকই নৌকো চালায়ে নিয়ে যাবো।

প্রিয় অবাক হয়ে বললে, কী বললি ?

—আপনারা ছইয়ের মধ্যে যান। সবাই তো যায়। রোদ্দুরের মধ্যে শুধু শুধু বসে আছেন কেন ?

প্রিয় আর মিলা চোখাচোখি করলো।

প্রিয় বললো, ও কি বলতে চায় বুঝতে পারলে ?

—না তো।

—সবাই ছই-এর মধ্যে যায়। তার মানে, ছেলেরা-মেয়েরা এই নৌকো ভাড়া করে প্রেম করতে আসে। ভেতরের আড়ালে বসে চুমু খায়। আরও হয়তো কিছু করে।

—বেশ করে। ভালো করে।

—তা হলে আমারও কি ভেতরে যাবো ?

—না আমাদের তো কিছু লুকোচুরির দরকার নেই। এই নদী আমার, এখানে আমি যেমন খুশি ব্যবহার করবো।

প্রিয় চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। কাছাকাছি আরও নৌকা আছে। তাছাড়া তারা পাড়ের থেকে বেশি দূরে আসেনি। অনেকেই তাদের এখনো দেখতে পাচ্ছে।

সে আকবরকে বললো, আরও একটু দূরে চল্‌রে।

আকবর বললো, না, না মাঝগাঙে গেলে তাল সামলাতে পারবেন না। লঞ্চের বড় বড় ঢেউ-এ উল্টে যেতে পারে।

—কিছু হবে না। তুই চল্‌তো !

মিলা বললো, হঠাৎ যদি নৌকাটা উল্টে যায়, কী হবে ?

প্রিয় বললো, তুমি আর আমি দু'জনেই সাঁতার জানি। ভয়ের তো কিছু নেই। এই আকবর তো জলের পোকা।

—কিন্তু নৌকোটার কী হবে ? এটা কি আর তোলা যাবে ? হ্যাঁরে, আকবর, তোলা যায় নৌকো ?

আকবর বললো, মাঝগাঙে ডুবলি সে নৌকো গেল। আর পাওয়া যাবে না। কিনারে কিনারে ডুবলি তবু তোলা যায়।

—তোদের নৌকো কখনো ডুবেছে ?

—হ্যাঁ। ডুবেছে একবার। ডায়মন্ডহারবার নিকটে, তখন বান ডেকেছিল।

—নৌকোটা আর পায়নি ?

—না।

—একটা নৌকোর কত দাম হয়রে ?

—এই নৌকোটার দাম সাড়ে তিন হাজার।

—বাপরে ! এত দাম দিয়ে নৌকো কিনেছিস, তোরা তো বেশ বড়লোক রে !

—ব্যাঙ্কে লোন দিয়েছে। মাসে মাসে সুদ দিতি হয়।

প্রিয় বললো, তোর কোনো চিন্তা নেই, আকবর। তোর ঐ নৌকো যদি হঠাৎ ডুবে যায়, আমরা দাম দিয়ে দেবো।

মিলা বললো, একটু বেশি দিও। চার হাজার।

আকবর মিটিমিটি চোখে চেয়ে রইলো ওদের দিকে। যেন সে বলতে চায়, আমায় ছেলেমানুষ ভেবেছেন ? আমি অনেক কিছু বুঝি ! নৌকো ডুবে গেলে কেউ টাকা দেয় না, নিজেদেরই ডুবতে হয়। আমি জানি কত ধানে কত চাল !

মিলা বললো, ছেলেটাকে কী সুন্দর দেখতে ! টিকালো নাক, টানা টানা চোখ....

এবারে আকবর লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরালো।

এখন ভাটার টান চলছে। নৌকো এগোচ্ছেই না বেশি। একটা লঞ্চ বেশ কাছ দিয়ে চলে যেতেই ঢেউগুলি উত্তাল হয়ে উঠলো।

মিলা হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, বাঃ ! দারুণ লাগছে। সত্যি নৌকোটা ডুবে গেলে বেশ হতো !

প্রিয় বললো, আমরা ভাটার টানে একেবারে বঙ্গোপসাগরে চলে যেতুম।

—তারপর ?

—তারপর সাগর পেরিয়ে মহাসাগর !

—বঙ্গোপসাগর দিয়ে ভাসতে ভাসতে কোথায় যাওয়া যায় ?

—ঐদিকে বোধহয় অস্ট্রেলিয়া। মাঝখানে আন্দামানের দ্বীপগুলো পড়বে।

—চলো, চলো, আমরা আন্দামানে চলে যাই।

—সেখানে তো নৌকো নিয়েই যেতে পারি। এ নৌকোটা বেশ মজবুত আছে।

—কী রে আকবর, যাবি ?

—কোথায় ?

—আন্দামান।

সে আবার কোথায় ?

—তুই আন্দামানের নাম শুনিসনি ? তোদের তো প্রায় বাড়ির পাশেই। যেতে মাত্তর দিন সাতেক লাগবে।

—এবারে ফিরতি হবে, বাবু। আমার বাবা বাজার থেকে এসে পড়বে।

—তোর কোনো চিন্তা নেই। তোর আব্বাস কাকাকে আমি বুঝিয়ে বলে এসেছি। আমরা কবে ফিরবো তার কোনো ঠিক নেই।

—না, না, না। আমি এখুনি ফিরে যাবো !

—লক্ষ্মী সোনা, ওরকম করো না, আচ্ছা ভয় নেই, তোকে আন্দামান নিয়ে যাবো না। কিন্তু তুই আর একটুখানি থাক।

মিলা অভিমান করে বললো, অন্তত মাঝগঙ্গায় না গেলে নৌকো চাপার কোনো মানেই হয় না।

—নিশ্চয়ই তোমায় মাঝগঙ্গায় নিয়ে যাবো, মিলা। আকবর, তুই এবারে বেশ কষে হাল ধর। হাঁই মারো মারো টান হাঁইয়ো হাঁইয়ো !

আকবর বললো, অমন করবেন না, বাবু ! বলছি তো, সামাল দিতে পারবেন না।

—ঠিক পারবো। বলেইছি তো, যদি বাইচান্স নৌকোটা ডুবে যায়, তোকে পুরো দাম দিয়ে দেবো। আবার ব্যাঙ্কের লোনও পাবি। জামাইবাবু কাকে বলে জানিস ? তোরা যাকে বলিস দুলাভাই, তিনি কোন্ বাড়িতে থাকেন জানিস ? ঐ যে ঐ বাড়িটায়।

প্রিয় আঙুল তুলে দূরের টাটা সেন্টারটা দেখালো।

এখান থেকে আর দেখা যায় মনুমেন্টের চূড়া, হাওড়ার ব্রিজ আর নিউ সেক্রেটারিয়েট।

এবারে হাওড়া ব্রিজটা দেখিয়ে বললো, ঐ যে ব্রিজ দেখছিস, জার্মান সাহেবরা এসে ঐ ব্রিজটা এই দিদিমণির কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিল। কত ঝুলোঝুলি। তাই না, মিলা ?

মিলা বললো, আমি রাজি হইনি। ঐ ব্রিজটা চলে গেলে আমার লোকদের কত ক্ষতি হবে।

প্রিয় বললো, আর ঐ যে মনুমেন্টটা। এখন যাকে শহীদ মিনার বলে, ওটাও তো এখান থেকে উঠিয়ে দিল্লি নিয়ে যেতে চেয়েছিল। দিল্লির কুতুব মিনারের খুব একা একা লাগে, তাই তার পাশে রাখবে। তোর দিদিমণি

তাতেও রাজি হয়নি।

মিলা বললো, গড়ের মাঠে গরু চরাতে এসে লোকেরা ঐ মনুমেন্টের গায়ে দড়ি বাঁধে। ওটা সরিয়ে নিলে চলবে কেন?

প্রিয় এরপর নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং দেখিয়ে বললো, ও বাড়িতে কারা থাকে জানিস? দিদিমণির চাকর-বাকররা। তাদের জন্য দিদিমণি ঐ বাড়িটা বানিয়ে দিয়েছে।

মিলা বললো, তাও তো ওদের জায়গা হচ্ছে না। আরও দু'-একটা ওরকম বাড়ি বানাতে হবে।

প্রিয় বললো, এখান থেকে চারপাশে যা কিছু দেখছিস, সবই এই দিদিমণির।

মাথার ওপরে আঙুল তুলে মিলা বললো, আর ঐ যে আকাশ, ঐখানে আমাদের আসল দেশ। অনেক দূরে।

এত সমস্ত কথা শোনার পর আকবর বললো, বিড়ির কৌটাটা দ্যান বাবু।

প্রিয় বললো, আচ্ছা দিচ্ছি, এই নে। বিড়ি ধরিয়ে নে। এইবার তুই একটু চোখ বোজ তো আকবর। তুই গুনতে জানিস তো? চোখ বুজে ঠিক একশো গুনবি।

—কেন?

—সব কথায় কেন জিজ্ঞেস করতে নেই। তুই ছেলেমানুষ, সব বুঝবি না। নে চোখ বুজে গুনতি চালু কর।

মিলা বললো, শুধু একশো গুনলে তো চলবে না। অন্তত পাঁচশো গুনতে হবে। একবারও ভুল করলে চলবে না। তুই যদি একটানা পাঁচশো গুনতে পারিস, তোকে আমি একটা খুব সুন্দর জিনিস দেবো।

—কী জিনিস দেবে দিদিমণি?

—আকাশ থেকে একটা তারা এনে দেবো। কিংবা তুই কি গোটা চাঁদটাই চাস?

—আমায় একটা সিনেমা দেখাবেন? আমি কোনোদিন দেখিনি।

প্রিয় বললে, সে কি রে, তুই প্রত্যেকদিন এত বিরাট একখানা সিনেমা দেখিস, তাও তোর অন্য সিনেমা দেখার শখ? ওপরে আকাশ আর নিচে জল, তার মাঝখানে কত নৌকো, স্টিমার, মানুষ, সারাদিন কতরকম আলো, রাত্তির বেলা কতরকম অন্ধকার, আর নৌকোর ছইয়ের মধ্যে ছেলেমেয়েরা যা করে, সিনেমায় তার চেয়ে বেশি দেখায় না রে।

মিলা বললে, তাহলেও ও যদি পাঁচশো গুনতে পারে, আমরা ওকে ইংরিজি সিনেমার টিকিট কিনে দেবো।

প্রিয় বললো, ঠিক আছে, তাই সই। এবার চোখ বুজে ফ্যালতো বাপধন !

প্রিয় জল থেকে বৈঠা তুলে নিতেই নৌকোটা ঘুরে গেল। তাতে চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই আবার চোখ মেলে আকবর বললো, আরে করেন কী ! করেন কী !

প্রিয় বললো, ঠিক আছে। ওতে কিছু হবে না। তুই চোখ বুজেই হাল ধরে থাক। নৌকোটা আপন মনেই ভাসতে থাকুক। তুই কিন্তু চোখ মিটমিট করে দেখতে পারবি না। নে জোরে জোরে গুনতে শুরু কর তো।

প্রিয় উঠে এসে বসলো মিলার পাশে।

মিলা নদী থেকে এক আঁজলা জল তুলে আনলো।

প্রিয় বললো, জল যেন ঠিক সময়। কিছুতেই মুঠোয় ধরে রাখা যায় না।

মিলা খুব মিষ্টি করে হাসলো প্রিয়র দিকে চেয়ে। তারপর তার সেই ভিজে হাতটা বুলিয়ে দিল প্রিয়র গালে।

প্রিয় বললো, আমার খুব ইচ্ছে করে, একদিন তুমি আর আমি এক সঙ্গে একই বাড়িতে ফিরে যাবো সন্ধেবেলা।

মিলা বললো, আমাদের তো কোনো বাড়ি নেই। আমরা তো এখন অজ্ঞাতবাসে লুকিয়ে আছি।

—আমরা দু'জনে যদি একই জায়গায় অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারতুম !

—তাহলে সবাই আমাদের চিনে ফেলতো।

—আমার মনে হয় কি জানো, মিলা, এবারে আমাদের জায়গা পালটানো দরকার। অন্য কোথাও, একটা বেশ বড় বাড়িতে দু'জনে একসঙ্গে অজ্ঞাতবাসে থাকবো।

—তাজমহল, তাজমহলটা খালি পড়ে আছে। ওর মধ্যে একটা ঘরে যদি আমরা আমাদের জন্য বিছানা পেতে নিই ?

—ঠিক বলেছো, তাহলে চলো সেখানেই যাওয়া যাক।

—তুমি আকবরকে চোখ বুজতে বললে কেন ? এরই মধ্যে ওর আশি গোনা হয়ে গেল।

—তোমাকে চুমু খাবার জন্য।

—সেই জন্যই তো আমি পাঁচশো পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলুম।

—ছেলেটা বোধহয় পিটপিট করে দেখছে।

—দেখুক। ও সিনেমা দেখতে চেয়েছিল।

মিলার পিঠে হাত দিয়ে প্রিয় তাকে কাছে টেনে আনলো। চুম্বনটি চললো দুশো বারো পর্যন্ত।

দম নেবার পর মিলা বললো, আমার বুকটা কী রকম কাঁপছে দেখো। আমার বুকে হাত দাও!

প্রিয় বললো, আকবর চোখ বুজে থাকলেও আরও অনেক চোখ আমাদের দেখছে। কাছেই আর একটা নৌকো।

—দেখুক। আমার নদীতে আমি যা খুশি করবো।

—মিলা, আমি তোমার মতন এত সাহসী হতে পারি না।

—তুমি যে বলেছিলে, আমরা যখন কাছাকাছি থাকবো, তখন আর কারুকে দেখবো না।

—আমি দেখি না। কিন্তু অন্যদের দৃষ্টি আমার গায়ে বেঁধে।

—তাহলে কি আমরা অজ্ঞাতবাস শেষ করে আকাশে ফিরে যাবো?

—এত তাড়াতাড়ি?

—না, না, ঠিক বলেছো, এত তাড়াতাড়ি নয়। এখনো কত শখ বাকি রয়ে গেছে।

—ওদিকে ওর আড়াইশো গোনা হয়ে গেল। সময় কী তাড়াতাড়ি চলে যায়।

—মিলা, একদিন যদি আমরা যাদবপুরের বাড়িতে না ফিরি তাহলে কী হয়?

—জানি না। ওরা সবাই মিলে খুব চ্যাঁচামেচি শুরু করবে বোধ হয়।

—তারপর আবার ভুলেও যাবে।

—মিলা, তুমি সমুদ্রে যাবে বলেছিলে।

—কবে? কখন যাবো?

—আজই? এখনই?

—এখনই?

—কেন নয়? ভাসতে ভাসতে চলে যেতে পারি।

—আমি রাজি।

—ভয় পাবে না?

—ভয়, কিসের ভয়? তুমি পাশে থাকলে আমি ভয় পাবো কেন?

—এই জলের দিকে তাকিয়ে দেখো। কী সুন্দর, মসৃণ। যেন কলাগাছের গায়ের মতন। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে না?

—জলের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মনে হয় জল আমাকে ডাকছে।

—তুমি সাঁতার দিতে পারবে? ক্লান্ত হয়ে পড়বে না?

—যদি ক্লান্ত হই, তুমি আমাকে ধরবে।

—যদি আমিও ক্লান্ত হই?

—তখন আমি তোমায় ধরবো। তুমি এত চিন্তা করছো কেন? আমাদের কথা ছিল না যে ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো চিন্তা করবো না?

—তাহলে আর দেরি করা চলে না। ওর চারশো পাঁচ হয়েছে। তুমি আঁচল জড়িয়ে নাও।

মিলা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলটা জড়িয়ে বাঁধলো কোমরে। মাথার খোঁপা খুলে দিল, চুল ছড়িয়ে পড়লো পিঠে।

প্রিয় তার শার্টটা খুলে ফেললো, তারপর হাত দুটো কোমরের কাছে এনে বেঁধে ফেললো।

শীতের আকাশের সূর্য এর মধ্যেই ম্লান হয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে গাঢ় রঙের খেলা। জলের মধ্যে যেন খেলা করছে রকমারি সব আয়না।

প্রিয় বললো, চলো, মিলা, আমরা সমুদ্রে যাই।

ঝপাং করে খুব জোরে শব্দ হতেই আকবর ভয় পেয়ে চোখ মেলে তাকালো।

সে দেখলো তার নৌকো খালি। কাছেই জল আন্দোলিত হচ্ছে তুমুলভাবে। কিন্তু ওদের দু'জনকে আর দেখা গেল না। যেন অলৌকিক দুটি প্রাণী হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

॥ ৪ ॥

গঙ্গার বুকে বিভিন্ন নৌকোয় হাঁকাহাঁকি, খোঁজাখুঁজি চললো খানিকক্ষণ। তবু প্রিয় আর মিলাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত সবাই সিদ্ধান্ত নিল আকবরই বানিয়ে বানিয়ে গল্প তৈরি করেছে। ঝড় বাদল কিছু নেই, এমনি এমনি ভর সন্ধেবেলা দু'জন জলজ্যান্ত মানুষ ইচ্ছে করে জলে ঝাঁপ দেবে কেন? ছোকরাবাবু আর দিদিমণিটি নিশ্চয়ই আগেই কখন নেমে গেছে। এ নিয়ে আর পুলিশে খবর দেবার দরকার নেই।

তারপর নদীর বুকে নেমে এলো অন্ধকার। এদিকে ওদিকে দুলছে কয়েকটা নৌকো, তাদের মধ্যে জ্বলছে মিটিমিটি আলো। সেই সব নৌকোয় বেড়াচ্ছে অন্য যুবক-যুবতীরা, এক সময় তারা জোড়ায় জোড়ায় ঢুকে পড়ছে

ছই-এর মধ্যে। এরা আবার ঠিকঠাক সময়ে বাড়ি ফিরে যাবে।

আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু জ্যোৎস্না নেই। হাওয়া বইছে মৃদু মৃদু।

মিলা আর প্রিয় কি তলিয়ে গেল গভীর জলে? ওদের বাবা মায়েরা জলের দেশ থেকে এপারে এসেছিল আশ্রয়ের খোঁজে। ওরা জল চেনে। স্রোত ওদের অসহায় করে দিতে পারে না।

ভাটার টানে ওরা কিছুক্ষণ ভেসে গেল নদীর নিচু বুকে। মিলিয়ে গেল শহর। তারপর আকাশ ঝাপসা হয়ে যেতেই প্রিয় জিজ্ঞেস করলো, মিলা, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়োনি তো?

মিলা বললো, একটুও না!

স্বর্গপুরীর মতন ঝলমলে আলোয় সাজানো একটা জাহাজ আসছে উল্টো দিক থেকে। ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠে ওরা ছিটকে গেল দু'দিকে। প্রিয় খুব ওস্তাদ সাঁতারু, মিলা কম যায় না। মিলাকে খুঁজে পেয়ে প্রিয় তার হাত চেপে ধরে বললো, এসো, এবারে ফিরি।

মিলা জিজ্ঞেস করলো, আমরা মহাসাগরে যাবো না?

—আজ নয়।

—তা হলে চলো, একটা কোনো দ্বীপে উঠি।

—এই তো পাশেই একটা দ্বীপ।

এতক্ষণ চিৎ সাঁতার দিচ্ছিল, এবারে ওরা ব্যাক স্ট্রোকে তীরের দিকে ফিরলো।

ওরা যেখানে উঠলো, সেটা কোনো দ্বীপ নয়। জায়গাটা ফলতার কাছাকাছি, জনমানবশূন্য। ওপরে উঠতে গিয়ে পায়ে জড়িয়ে অনেকটা ছিঁড়ে গেল মিলার শাড়ি। প্রিয়র জামার পকেটে ছিল দুটি সিগারেট আর দেশলাই, সেগুলির অবস্থা কহতব্য নয়।

একটা ঝুপসি অশথ গাছের তলায় বসে ওরা হাঁপাতে লাগলো। এই গাছের ডালে ডালে অনেক পাখির বাসা, সব পাখি বাড়ি ফিরে এসেছে। সন্ধের পর তারা ডাকে না কিন্তু ডানার ঝটপট শোনা যায়।

মিলা আর প্রিয় দু'জনেরই পায়ের চটি ফেলে এসেছে নৌকোয়।

মিলা জিজ্ঞেস করলো, এটা কোন্ জায়গা? কী করে আমরা বাড়ি ফিরবো?

—বাড়ি ফিরতে চাও? অনায়াসেই ফেরা যায়। রাস্তা খুঁজে বার করতে আর অসুবিধে কী?

—আর যদি বাড়ি ফিরতে না চাই?

—তা হলে আমরা এখানেই থাকতে পারি। এই গাছতলাতেই একটা কুঁড়েঘর বাঁধবো!

হঠাৎ মিলা হু হু করে কেঁদে উঠলো। প্রিয় একেবারে অবাক।

সে মিলার ভিজে মুখে তার ঠাণ্ডা হাত রেখে বললো, এ কী, তোমার কী হলো, মিলা? তোমার কষ্ট হচ্ছে? তুমি ভয় পাচ্ছো? বাড়ির জন্য চিন্তা হচ্ছে?

চোখ তুলে মিলা বললো, আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে! যদি আর কোনোদিন ফিরে না যাই .... আমাদের কেউ দেখতে না পায়, চিনতে না পারে—

প্রিয় বললে, মনে করো এইটাই আমাদের দ্বীপ।

মিলা বললো, না, আমরা সত্যিকারের একটা দ্বীপে চলে যাবো। চলো—

তবু ওরা তখুনি উঠলো না। বসে রইলো গলা জড়াজড়ি করে। গায়ে ভিজে সপসপে জামা-কাপড়,তবু গ্রাহ্য নেই।

দূর থেকে এই সময় ওদের কেউ দেখলে হঠাৎ ভাববে, ওরা মানুষ নয়। কোনো অলৌকিক প্রাণী। অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে।

ছবি

যোগেন আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে ছেলেকে সে কোথাও রেখে আসতে পারবে না। ছেলেও তার সঙ্গে যাবে। চুনী বলেছিল, তা তো বটেই, তা তো বটেই, ঐটুকু ছেলে একলা একলা থাকবে কোথায় ? তাকেও নিয়ে আসবেন অবশ্যই।

ভবতোষ অবশ্য শুনে অবাক হয়েছিল। ভুরু কপালে তুলে বলেছিল, সেকি যোগেনদা, তুমি বাঁটুলকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ! হে-হে-হে-হে।

আপন মনেই হাসতে শুরু করেছিল ভবতোষ। ব্যাপারটা যে একটুখানি কেমন কেমন তা যোগেনও বোঝে। কিন্তু উপায়ই বা কী ?

ভবতোষ বলেছিল, বাঁটুলকে তুমি আমাদের বাড়িতে রেখে যাও। দুটো-তিনটে দিন তো মোটে !

যোগেন বলেছিল, ও থাকবে না। কান্নাকাটি করবে। আমায় ছেড়ে তো কোনদিন থাকেনি।

ভবতোষ বলেছিল, কোনদিন থাকেনি—তা বলে দু-তিন দিনের জন্য পারবে না কেন ? সাত বছর বয়েস, ওকে তো আর এখন খাইয়ে দিতে হয় না ! আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলো করবে। আমার বউ ভালোমানুষ, কারুকে বকাঝকা করে না।

যোগেন বলেছিল, নাঃ, তা হবে না। নিয়েই যাবো সঙ্গে। এখানে রেখে গেলে আমারই মনটা ছটফট করবে !

ভবতোষ তখন আবার হাসতে আরম্ভ করে দিয়েছিল।

শুক্কুরবার যাওয়া, সোমবার ফেরা। সোমবার থেকে যোগেনের নাইট শিফ্‌ট, ফিরে এসে সেদিনই সে কাজে যোগ দিতে পারবে। এই প্রস্তাব শুনেও ভবতোষ হ্যা হ্যা করে হেসেছিল। তারপর বলেছিল, যোগেনদা, তোমার ভেতরটা কি একেবারে চাঁছাছোলা ? রস-কষ সব নিংড়ে বার করে দিয়েছো ? ফিরে এসেই নাইট ডিউটি ? সেদিন তো তোমার নিজের বাড়িতেই নাইট ডিউটি দেবার কথা !

কলকাতায় যাওয়া হবে শুনে বাঁটুলের খুব আহ্লাদ হয়েছে। কলকাতা যে কী বস্তু তা বাঁটুল সঠিক জানে না, তবে সে এইটুকু জানে যে সেখানে ট্রেনে চেপে যেতে হয়। তাদের বাড়ি থেকে দূরে ট্রেন লাইন দেখা যায়,

ট্রেনের আওয়াজ শুনলেই জানলার কাছে ছুটে যায় বাঁটুল। বড় বড় বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে দেখে একটা লম্বা রেলগাড়ি কোন অজানা জগতের দিকে চলে যাচ্ছে। সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, বাবা, বলো তো, এটা মাল না প্যাসেন্ ?

বাবা আর ছেলের মধ্যে এটা একটা প্রিয় খেলা। প্যাসেনজার ট্রেন কোন্ কোন্ সময় যায় তা যদিও যোগেনের মুখস্থ, তবুও মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ভুল বলে সে ছেলেকে আনন্দ দেয়। প্যাসেনজার ট্রেনকে মালগাড়ি বললেই বাঁটুল হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, হলো না, হলো না। প্যাসেন্ ! প্যাসেন্ !

কেন কলকাতায় যাওয়া হচ্ছে তা অবশ্য ছেলেকে এখনো বলেনি যোগেন। বলি বলি করেও বলা হয় না। মুখে আটকে যায়। যাই হোক, সঙ্গে যাচ্ছে যখন, বাঁটুল তো বুঝতেই পারবে। এইটুকু বোঝার বয়েস হয়েছে।

চুনী এসে যখন প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন বেশি ভাবনাচিন্তা করেনি যোগেন। রাজি হয়ে গিয়েছিল সহজেই। তাদের কারখানায় চুনী যোগ দিয়েছে বছর দু'-এক হলো। যোগেনের সঙ্গে আগে তেমন পরিচয় ছিল না। যোগেনের তেমন মিশুকে স্বভাবও নয়। কারখানায় ডিউটির সময় নিজের মনে কাজ করে, তারপর বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে মা-মরা ছেলে। লতিকা চলে গেছে তিন বছর আগে। ওঃ কী ভয়ংকর সময় গেছে তখন ! লতিকা অসুখে পড়ার এক মাসের মধ্যেই জানা গেল সে আর বাঁচবে না। কারখানার হাসপাতালের ডাক্তার বলেছিলেন, একবার ভেলোর নিয়ে গিয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারো। তা ছাড়া আর কোনো আশা নেই। ডাক্তারবাবুদের ওরকম বলা কর্তব্য তাই তিনি বলেছেন। কুলটির কারখানার সামান্য একজন ফিটার কি তার বৌকে নিয়ে ভেলোরে চিকিৎসা করাতে যেতে পারে ? ওসব চিকিৎসা যদি গরিবদের জন্যই হবে, তা হলে তো জেলায় জেলায় ওরকম হাসপাতাল থাকতে পারতো।

লতিকা মরবেই জানা কথা, তবু সে ছ'মাস বিছানায় শুয়ে থেকে যোগেনকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে গেল। যে-রুগী বাঁচবে না তারও চিকিৎসা করাতে হয়, তাকেও খেতে দিতে হয়, বিছানা নোংরা করলে তা পরিষ্কার করে দিতে হয়। যোগেনের এক এক সময় ইচ্ছে করতো লতিকার গলা টিপে ধরতে। টাকা ধার করতে করতে যোগেন একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। লতিকা গেল যোগেনকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে। আর এই ছেলেকে রেখে।

যোগেন চেয়েছিল ছেলেকে মামাবাড়িতে রেখে দিতে, অন্তত কয়েকটা

বছর। কিন্তু লতিকার দুই দাদা, তারা একেবারে চশমখোর, তিন মাসের মধ্যে বাঁটুলকে ফেরত দিয়ে গেল।

সেই বয়েসেই বাঁটুল নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল, পৃথিবীতে বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। ঐ বয়েসের শিশুরও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি থাকে, তাই বাবাকে একেবারে আঁকড়ে ধরেছিল সর্বক্ষণের জন্য। এমনকি প্রথম দেড় বছর নাইট ডিউটির সময়ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়েছে যোগেনকে। ফোরম্যানের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মেশিনগুলোর এক পাশে শুইয়ে রাখতো বাঁটুলকে।

কলকাতায় যোগেনের সঙ্গে যাবে আর মাত্র দু'জন। ভবতোষ আর সিদ্ধিনাথ। ওরা একেবারে যোগেনের পাশাপাশি কাজ করে। কোয়ার্টারও কাছাকাছি।

কুলটি স্টেশন থেকে উঠলে ট্রেনে জায়গা পাওয়া যায়। কিন্তু আসানসোল এলেই ভিড় হয়ে যাবে। ওরা কামরার এককোণে সতরঞ্চি পেতে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সিটের ওপর হাঁটুগেড়ে বসে জানলা দিয়ে বাইরের চলন্ত দৃশ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে বাঁটুল।

সিদ্ধিনাথই প্রথম কথাটা ফাঁস করে দিল বাঁটুলের কাছে।

সিদ্ধিনাথের মুখ আলগা।

সিদ্ধিনাথ বললো, আজ আর বিড়ি খাবো না। সিগ্রেট যোগেনদা! ওদের কাছ থেকে তো দু' হাজার টাকা পাবে।

যোগেন বিড়ি-সিগারেট তেমন খায় না। পানও খায় না। অবশ্য শুভ-কাজে যে পান তামাক দিতে হয়, তা সে জানে। সে ওদের জন্য পান আর একটা সিগারেটের প্যাকেট কিনে দিল।

ফুক ফুক করে সিগারেট টানতে টানতে সিদ্ধিনাথ বললো, ছেলেবেলায় বুঝলে, আমি কোন্নগরে থাকতুম। রোগা ডিগডিগে চেহারা ছিল, পাড়ার ছোঁড়াদের হাতে প্রায়ই মার খেতুম। একটা রুস্তমমার্কা ছেলে একদিন আমার নাকে একটা ঘুষো মেরে বলেছিল, ফের যদি ত্যাঁদড়ামি করবি তো বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেবো একদম! বুঝলে যোগেনদা, কথাটা আমার আজও মনে আছে।

তারপর সে বাঁটুলের পিঠে একটা চাপড় মেরে বললো, কী রে, বাঁট্‌লো তুই বাপের বিয়ে দেখতে যাচ্ছিস?

বাঁটুল মুখ ফিরিয়ে তাকায়। কথাটার মর্ম সে তখুনি বুঝতে পারে কি না কে জানে। ভবতোষ তার দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করেছে।

বাইরের রোমাঞ্চ বাঁটুলকে আবার টেনে নেয়।

সিদ্ধিনাথ জিজ্ঞেস করে, ক'ভরি সোনা দেবে ?

যোগেনের বদলে ভবতোষ উত্তর দেয়, বলে গেছে তো তিন ভরি। আমি যোগেনদাকে বলেছিলুম, পাঁচের কমে রাজি হয়ো না।

সিদ্ধিনাথ বললো, যদি খাঁটি দেয় তো তিনই কম নয়। বাজারটাও তো দেখতে হবে। দু'হাজার টাকা ক্যাশ, আর এই ট্রেন ভাড়া-ফাড়া আলাদা দেবে তো ?

যোগেন বললো, তা দেবে ! প্রথমে এক হাজারের ওপর উঠতেই চায়নি। আমি বললুম, দেড় হাজার টাকা তো দারোয়ানের ধার শোধ করতেই চলে যাবে। মাসে দুশো টাকার ওপর সুদ কাটছে, বউ আনলে খাওয়াবো কী করে ?

—ঠিক বলেছো। এই বাজারে সোংসারে একটা প্রাণী আনা কি কম কথা ! তা যোগেনদা, পাত্রী একবার নিজের চোখে দেখলে না আগে ? খুঁতো-টুঁতো নয় তো ?

—ভবতোষ দেখেছে। ও কলকাতায় গেস্‌লো।

ভবতোষ বললো, হ্যাঁ, আমি দেখিছি। এমনিতে তো ভালোই মনে হলো। গায়ে-গতরে খাটতে পারবে মনে হয়। তবে বাড়ির অবস্থা বেশ খারাপ, জবরদখল কলোনিতে থাকে, তাও নিজেদের জমি নেই। অন্যের সঙ্গে ভাগ করে থাকে।

সিদ্ধিনাথ বললো, সে যাক গে ! যোগেনদা শ্বশুরবাড়িতে যাবে থোড়াই ! বাড়িতে একটা বউ আনা দরকার...তা ওরা বর নেবার জন্য একটা লোক পাঠালো না ? আমরা এমনি এমনি ড্যাং ড্যাং করে যাবো ?

যোগেন বললো, চুনী একবার বলেছে সে কথা। ওদেরও লোক কম। আমি বলেছি, তা ঠিক আছে। আমরা নিজেরাই যাবো। তবে হাওড়া এস্টেশানে যেন ট্যাক্সি থাকে।

সিদ্ধিনাথ বললো, বাঙালরা খাওয়ায় ভালো। খ্যাঁটটা ভালোই হবে মনে হচ্ছে। তোমরা সোমবার ফিরবে তো ? আমি তার মধ্যে ব্যারাকপুরে একবার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসবো।

ভবতোষ বললো, বৃষ্টি-বাদলার দিন, লগ্ন হলো সেই মাঝরাত্তিরে !

সিদ্ধিনাথ বললো, ওসব লগ্ন ফগ্ন আজকাল কেউ মানে না। সন্ধে সুন্ধি মিটিয়ে দিও।

তারপরই সে যোগেনের উরুতে একটা চাপড় মেরে বললো, কী যোগেনদা, এরকম চুপ মেরে আছো কেন ? যাচ্ছো একটা শুভকাজে।

হাওড়া স্টেশনে এসে কারুকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ভবতোষ অবশ্য বাড়ি চেনে, কিন্তু সিদ্ধিনাথ বললো, যাঃ মাইরি, এভাবে কেউ বিয়ে করতে যায়? তারপর গিয়ে যদি দ্যাখো ছাদনাতলায় অন্য কোনো মক্কেল বসে আছে?

বাঁটুল শক্ত করে চেপে ধরে আছে বাবার হাত। নানারকম কথা শুনতে শুনতে সে একবার বললো, বাবা, তোমার বিয়ে হবে, আমার হবে না?

সিদ্ধিনাথ বললো, চল ব্যাটা, আজ তোরই বিয়ে দেবো! যোগেনদা, এসেছি যখন এমনি এমনি ফিরে যাচ্ছি না। না হয় শেষ পর্যন্ত সোনাগাছিতেই যাবো।

এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলো চুনী। হাওড়া ব্রিজের ওপর বিরাট জ্যাম, তাই তাকে লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়ে আসতে হয়েছে। সারা শরীর মুচড়ে মুচড়ে সে ক্ষমা চাইতে লাগলো। তাকে একাই প্রায় সব দিক সামলাতে হচ্ছে।

ট্যাক্সির বদলে লঞ্চেই ওদেরও গঙ্গা পার হতে হলো। তারপর একটা ফাঁকা মিনিবাস দেখে উঠে পড়লো। অন্য কেউ তার টিকিট কাটছে এই অভিজ্ঞতা যোগেনের নেই। তার প্রথম বিয়ে হয়েছিল শক্তিগড়ে, তার মামার বাড়ি থেকে তিনখানা বাড়ি পরেই ছিল শ্বশুরবাড়ি, যোগেন পায়ে হেঁটেই গিয়েছিল।

যাদবপুর পেরিয়ে বাঘা যতীনের মোড়ে নেমে আবার রিকশা। ঘোর-প্যাঁচ গলি। একটা ছোট ডোবার পাশে এসে রিকশা থামতেই চুনী বললো, একটু দাঁড়ান, একটু বাইরে অপেক্ষা করুন, আমি ভেতর থেকে আসছি।

তারপর ওরা দাঁড়িয়ে আছে তো, দাঁড়িয়েই আছে। চুনীর আর দেখা নেই। জায়গাটা পাড়া-গাঁ, পাড়া-গাঁ মতন, ঝোপঝাড় হয়ে আছে, ডোবাটার তিন পাশে কয়েকখানা ছ্যাঁচাবেড়ার ঘর। এখন ফটফটে বিকেল, কিন্তু মানুষজন দেখা যাচ্ছে না একটাও! সিদ্ধিনাথ মুখখানা বিকৃত করে আছে। যেন সে বলতে চায়, এই নাকি বিয়েবাড়ি!

যোগেন অবশ্য নিরাশ হয়নি। চুনী কিছু লুকোছাপা করেনি, পরিষ্কার জানিয়েছিল যে তার এক কাকিমা বাংলাদেশ থেকে সদ্য চলে এসেছেন, সঙ্গে দুই মেয়ে আর এক ছেলে, সহায়-সম্বল কিছু নেই। বড় মেয়েটির ছাব্বিশ বছর বয়েস, বিয়ে না দিলেই নয়, এক দূর সম্পর্কের দাদার বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে আছে। যোগেনকে সব জেনেশুনেই বিয়ে করতে হবে। তবে মেয়ে ভালো।

একটা নেড়িকুত্তা ছুটতে ছুটতে এসে ওদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গা শুঁকতে লাগলো। একটা বাচ্চা ছেলে ডোবাটার ধারে নেমে গিয়ে ইজের খুলে বসে গেল ওদের দিকে পেছন ফিরে। সাইকেল রিকশা চালক দুটি অধৈর্য হয়ে বললো, কী দাদা, কী হলো? আমাদের ছেড়ে দিন না, চলে যাই।

সিদ্ধিনাথ বললো, ভাড়াও কি আমাদের মেটাতে হবে নাকি?

এবারে দু'জন শুকনো চেহারার বয়স্কা মহিলা একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শাঁখে ফুঁ দিতে লাগলেন। চড়া রোদের মধ্যে সেই শাঁখের আওয়াজ কেমন যেন অদ্ভুত চিৎকারের মতন মনে হলো।

চুনী একটা পলিথিনের মগে করে জল এনে যোগেনকে বললো, দাদা, একটু চটি খুলুন, পা ধুয়ে নিন।

সিদ্ধিনাথ আর ভবতোষ পরস্পর চোখাচোখি করলো। এইরকমই বুঝি বাঙালদের বর-বরণ করার ধরন।

সিদ্ধিনাথ বললো, বাঁটুল তুই-ও পা ধুয়ে নে!

একটা ঘরে একখানা তক্তাপোষের ওপর ফর্সা চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বোঝাই যায়, ঘরটা খালি করা হয়েছে এই মাত্র। ঘরের এককোণে ঠেলে রাখা হয়েছে তিনটে টিনের বাক্স, কিছু ময়লা কাপড়চোপড় দলামোচা করে রাখা আছে একপাশে।

চুনী বললো, বসুন, বসন, একটু বিশ্রাম করুন। কী খাবেন, চা না কোল্ড ড্রিংকস্?

সিদ্ধিনাথ বললো, আপনাদের এদিকে ডাব পাওয়া যায় না?

চুনী বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

তারপর সে বাঁটুলের হাত ধরে বললো, চলো বাবা, তুমি ভেতরে চলো।

বাঁটুল একেবারে সিঁটিয়ে গিয়ে বাবার জামা চেপে ধরলো।

সিদ্ধনাথ বললো, যা না, ভেতরে যা, তোর তো খিদে পেয়েছে?

বাঁটুল সুর করে বললো, না-আ-আ।

যোগেন বললো, থাক, থাক, ও এখানেই থাক।

আধঘণ্টার মধ্যেও কিন্তু ডাব এলো না। চুনীরও টিকির দেখা নেই। সিদ্ধিনাথ বললো, এ কি বাবা, ডাব আনতে কি ডায়মন্ডহারবার চলে গেল নাকি?

ভবতোষ বললো, এই সিদ্ধি, একটু আস্তে—

সিদ্ধিনাথ বললো, কেন আস্তে? বরযাত্তির বলে কোনো খাতির নেই?

এ কেমনধারা বিয়ে? ছেলেটার খিদে পেয়েছে বললুম—

যোগেন বললো, আসবে,. আসবে।

সিদ্ধিনাথ তাকে ধমক দিয়ে বললো, তুমি অত মিউ মিউ করছো কেন, যোগেনদা? তোমার কি অন্য কোথাও পাত্রী জুটতো না? তুমি ফ্যালনা কিসে?

—ভবতোষ, একটু মুখ বাড়িয়ে দ্যাখো না, চুনীকে পাও কি না!

—আমাদের বসিয়ে রেখে গেল, তারপর আর একটা লোকের দেখা নেই!

—ভেতরে কিসের যেন একটা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে?

—কেউ কাঁদছে নাকি?

সিদ্ধিনাথ চোখ বড় বড় করে বললো, ও দাদা, এ কোথায় এলাম? বিয়েবাড়িতে কান্না?

যোগেন বললো, দ্যাখো, হঠাৎ কোনো বিপদ-আপদ হয়েছে কি না!

কথা বন্ধ করে ওরা কান খাড়া করে শুনলো। সত্যিই দু'-তিনজনের মিলিত কণ্ঠের কান্নার শব্দ ভেসে আসছে বাড়ির ভেতর থেকে। কেউ একজন সেই কান্না চাপা দেবার চেষ্টা করছে, আরও কেউ একজন দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

সিদ্ধিনাথ এবারে ঘর থেকে বেরুতে যেতেই একটি কিশোরী আর একটি দশ-এগারো বছরের বাচ্চা এসে ঢুকলো। তাদের হাতে কয়েকটা ডাব আর একটা প্লেটে কিছু সন্দেশ।

যোগেন বললো, ঐ তো ডাব এসে গেছে।

ঠোঁটকাটা সিদ্ধিনাথ বললো, গেলাসও জোটেনি! আমরা কারখানার ওয়ার্কার বলে কি ডাব মুখে দিয়ে খেতে হবে!

কুলটির দিকে ডাব পাওয়া যায় না, আসানসোল বাজারে মাঝে মাঝে ওঠে বটে, তাও বেশ দাম। শেষ কবে ডাব খেয়েছে তা যোগেনের মনেও পড়ে না। সে একটা ডাব নিয়ে বললো, আয় বাঁটুল, খেয়ে দ্যাখ এইভাবে ধর, দেখিস যেন জামায় না পড়ে!

সিদ্ধিনাথ ভবতোষকে বললো, আগে সন্দেশ খেয়ে নে, তারপর ডাব খাবি। এদের কাছে জল চাইলে আবার আধঘণ্টা লাগিয়ে দেবে।

ভবতোষ বললো, সন্দেশটার টেস্ ভালো। আমাদের ওদিকে এরকম পাওয়া যায় না।

সিদ্ধিনাথ জিজ্ঞেস করলো, ভেতরে কে কাঁদছে খুকি?

মেয়েটি বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে বললো, কই কেউ না তো!

—ঐ যে কান্নার শব্দ শুনছি। কারুর কিছু হয়েছে?

—জানি না।

মেয়েটি ডাব কটা নামিয়ে রেখে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এলো জলের জগ আর কয়েকটি কাচের গেলাস নিয়ে।

ভবতোষ এবার চোখ দিয়ে ধমকালো সিদ্ধিনাথকে। সিদ্ধিনাথ সহজে লজ্জা পায় না। সে মেয়েটির সঙ্গে গল্প করার ভঙ্গিতে বললো, তোমার নাম কী?

পুষ্প।

—তুমি চুনীলালের কে হও?

—উনি আমার দাদা।

মেয়েটি আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল।

ছোট ছেলেটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টে সে দেখছে শুধু যোগেনকে।

সিদ্ধিনাথ এবারে তাকে ধরে জিজ্ঞেস করলো, এই খোকা, ভেতরে কাঁদছে কারা? কী হয়েছে?

ছেলেটি বললো, বড়দি অজ্ঞান হইয়া গ্যাছে।

—বড়দি, তোমার বড়দি? তারই তো বিয়ে হবে?

ছেলেটি নীরব। খবরটা শুনে যোগেনও চঞ্চল হয়ে উঠলো। এ আবার কী ব্যাপার? বিয়ের কনে অজ্ঞান হয়ে যায় কেন? ফিটের ব্যারাম আছে নাকি? সে ভবতোষের দিকে তাকালো।

ভবতোষ ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার বড়দির আজ বিয়ে হবে। সেই অজ্ঞান হয়ে গেছে?

ছেলেটি দু'বার মাথা নাড়লো।

—কেন, অজ্ঞান হয়েছে কেন? অসুখ...

ছেলেটি যোগেনের দিকে আঙুল তুলে বললো, ওকে দেখে। বড়দি ভয় পাইছে!

একটা দুঃখের স্রোত যোগেনের বুকের ভেতর দিয়ে নেমে গেল তলার দিকে। তার চেহারা ভালো নয়, কারখানায় অনেকেই তাকে পোড়া কাঠ বলে ডাকে। কিন্তু চুনী তো তাকে দেখেশুনেই প্রস্তাবটা দিয়েছিল। যোগেন তো পাত্রী দেখতেও চায়নি। সে তো সুন্দরী মেয়ে দাবি করেনি।

সে বাঁটুলের দিকে তাকালো। বাঁটুল কি বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা?

বাঁটুল তার বাবাকে ভালোবাসে, সে তার বাবাকে অসুন্দর মনে করে না।

সবাই চুপ করে আছে, এর মধ্যে চুনী ঘরে ঢুকে বললো, আপনাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? ডাব দিয়ে গেছে?

সিদ্ধিনাথ চুনীকে একপাশে টেনে নিয়ে বললো, কী ব্যাপার বলুন তো? মেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে কেন? সেরকম বুঝলে এখনো আমরা রাজি হতে না পারি!

চুনী প্রথমে এ-কথা সে-কথা বলে পাশ কাটাবার চেষ্টা করেও পারলো না। সিদ্ধিনাথকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

তারপর চুনী বললো, আপনাকে সত্যি কথা বলছি, দাদা। পাত্রীর ফিটের ব্যারাম-ট্যারাম কিছু নেই। স্বাস্থ্য ভালো। পাড়া-গাঁ থেকে এসেছে তো—মানে, বুদ্ধিশুদ্ধি এখনো তেমন পাকেনি। পুরুষমানুষের চেহারায় কী আসে যায়, গুণই আসল...পাকা চাকরি, ছোট সংসার, আমি আগেই বলেছিলাম যে পাত্র দোজবর ঠিকই, কিন্তু বয়েস খুব বেশি নয়, শরীরে রোগ-ব্যাধি নেই, রং না হয় একটু কালো।

সিদ্ধিনাথ বললো, একটু না, বেশ কালো! যোগেনদা কালো ঠিকই, আপনিও কালো, আমিও কালো, যোগেনদা না হয় ঘষ্‌টা ঘষ্‌টা কালো, তা বলে মেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে? তার মানে বিয়ে করতে চায় না।

—না, না, না, সেরকম কিছু না। মেয়ের একটু দুঃখ হয়েছে আর কি! অল্পবয়সী মেয়ে তো রঙের দিকে একটু চোখ থাকে। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এর মধ্যেই তো উঠে বসেছে।

—সত্যি করে বলুন তো, মেয়ের লাভার আছে?

চুনী একেবারে চমকে গিয়ে দুপা পিছিয়ে যায়। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, কী বলছেন, দাদা? মাত্র আড়াই মাস আগে ওপার বাংলা থেকে এসেছে। এখানে কারুকে চেনেই না।

—ওপার বাংলায় কেউ ছিল হয়তো!

—এ মেয়ে কারুর সঙ্গে মুখ ফুটে কথা বলতেই জানে না। আমি বলছি, দেখে নেবেন এ মেয়েকে নিয়ে আপনারা ঠকবেন না।

—আগের পক্ষের ছেলে আছে তা বলেছেন?

—সব জানে! ও ছোট ছেলেমেয়েদের ভালোবাসে।

সিদ্ধিনাথ যোগেনকে কাছে ডেকে বললো, দ্যাখো দাদা, আমরা বলে দিচ্ছি যে মেয়ের যদি বিয়েতে আপত্তি থাকে তা হলে আমরা এখনো চলে যেতে পারি। সেরকম গরজ তো কিছু নেই।

যোগেন গম্ভীরভাবে বললো, তা তো বটেই!

চুনী হাতজোড় করে বললো, মেয়েটার তা হলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে

যাবে ! মেয়ের অমতের কোনো প্রশ্নই নেই। মা যা বলে মেয়ে তাই শোনে। যদি বলেন তো মেয়ের মাকে ডেকে দিই।

সিদ্ধিনাথ বললো, আমি একবার মেয়েকে দেখতে চাই। কথা বলতে চাই। আপনি সেই ব্যবস্থা করুন।

চুনী বললো, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই !

একটু বাদে সিদ্ধনাথ ভেতর থেকে ঘুরে এলো। হঠাৎ সে খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। শুধু বললো, ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

ভবতোষ জিজ্ঞেস করলো, কেমন দেখলে সিদ্ধিদা ?

যোগেনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সিদ্ধিনাথ বললো, ভালো।

—তোমার সঙ্গে কথা-টথা বললো ?

—লজ্জা পাচ্ছিল। তবে বলেছে, দু'-একটা কথা বলেছে।

—অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কেন ?

—ওরকম হয়। বিয়ের দিনে অনেক মেয়েরই এরকম হয়।

—আর কী হলো, খুলেই বলো না।

—আমি প্রথমেই গিয়ে বললুম, আমি কিন্তু পাত্তর নই, আমার ঘরে একটা জবরদস্ত বউ আছে, আর দুটো বাচ্ছা.... তবে এ'মেয়ে দেখে আমার মনে হলো, ইস, যদি আমারও বউ মরে যেত তবে আমিই...

সন্ধের পরেই ছিপছিপ করে বৃষ্টি নামলো। লোকজনও আসতে লাগলো কিছু কিছু। চারপাশটা অন্ধকার। এদিকে ইলেকট্রিসিটি নেই, ভেতর বাড়িতে একটা হ্যাজাক জ্বালানো হয়েছে। উঠোনে চারখানা বাঁশ পুঁতে তার ওপর চট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হলো। সেখানেই বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। লোকজনের বসার কোনো জায়গা নেই, তারা এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে জটলা করছে।

পুরুতমশাই নারায়ণশিলা নিয়ে এই ঘরেই বসে আছেন। সিদ্ধিনাথ একবার তাঁকে বোঝাবার চেষ্ট করলো, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি নন। লগ্ন হলো এগারোটা গতে, তার আগে তিনি কিছুতেই বিয়ে শুরু করতে রাজি নন।

খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল সাড়ে আটটার মধ্যেই। সব শুদ্ধ তিরিশ-চল্লিশজন লোক। বৃষ্টির বিরাম নেই। ভেতর দিকে একটি বাড়ির বারান্দায় মেঝেতে কলাপাতায় পরিবেশন করা হলো খাবার। দু' ব্যাচে শেষ হয়ে গেল। বাঁটুলকে নিয়ে যাওয়া বেশ মুশকিল হয়েছিল, বাবা যাবে না শুনে সেও যেতে চায়নি। সবাই খেতে যাবে, বাবা কেন যাবে না ?

প্রায় জোর করেই নিয়ে যাওয়া হলো তাকে।

ফিরে এসে ভবতোষ বেশ তৃপ্তির সঙ্গে ঢেঁকুর তুললো। খাওয়াটা বেশ

ভালো হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। সে শুধু যোগেনের দিকে তাকিয়ে বললো, একেবারে টাটকা ইলিশ, রান্নাও অন্যরকম...।

সিদ্ধিনাথের সেই উৎফুল্ল ভাবটা হঠাৎ একেবারেই চলে গেছে। কেন যেন বেশ মন-মরা দেখাচ্ছে তাকে।

খেয়ে এসেই বাঁটুল আবার বাবার পাশটিতে বসে পড়লো।

ভবতোষ বললো, আমাদের রাত্তিরে শুতে হবে এই ঘরেই। ওদিকে আর একটা ঘরে বাসরের ব্যবস্থা করেছে। বাঁটুল, তুই এই পাশটায় শুয়ে পড় !

কিন্তু বাঁটুল শোবে না এখন। সে খালি মাথা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছে ! কী যে ব্যাপারটা ঘটছে সে এখনো বুঝতে পারছে না।

মাঝখানে কয়েকবার ঢুলে ঢুলে পড়লেও কন্যাপক্ষ যখন বর তুলতে এলো, তখনই আবার জেগে উঠলো বাঁটুল। তারপর সে একটা কাণ্ডই বাধিয়ে তুললো।

ভবতোষ তাকে জোর করে ধরে রাখবার চেষ্টা করলেও সে কিছুতেই থাকবে না। সে যাবেই বাবার সঙ্গে। ভবতোষ বোঝালো, বাবা ঐ উঠানেই থাকবে, আমরা জানলা দিয়ে দেখবো, তাও বাঁটুল বাবার হাত ছাড়বে না। তারপর সে কেঁদে উঠলো খুব জোরে।

অগত্যা বাঁটুলকে সঙ্গেই নিয়ে যেতে হলো। ছাঁদনাতলায় সে বাবার গা ঘেঁষে বসে রইলো বাবু হয়ে। বৃষ্টির সঙ্গে এখন আবার শনশন করে হাওয়াও দিচ্ছে। নিমন্ত্রিতরা প্রায় সবাই চলে গেছে, দু'চারজন মহিলা শুধু ঘুরঘুর করছে কাছাকাছি।

কন্যার জ্যাঠামশাই কোনো কারণে শেষ মুহূর্তে আসতে পারলেন না, কন্যা সম্প্রদান করার ভার নিতে হলো চুনীকেই। সে কোমরে একটা গামছা জড়িয়ে পরিবেশন করছিল, সে গামছাও খুলতে ভুলে গেল।

যোগেন পরেছে ধুতির ওপর খদ্দরের গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। এরা একটা টোপর মাথায় দিয়ে দিয়েছে। গলায় দিয়েছে একটা রজনীগন্ধার মালা। তার বেশ লজ্জা লজ্জা লাগছে।

পাত্রীকে দেখে যোগেন একেবারে হতবাক। সে কি স্বপ্ন দেখছে ? এইরকম মেয়ের সঙ্গে কি তার বিয়ে হতে পারে ? ফর্সা রং, মুখখানি যেন পদ্মফুলের মতন, বেশ লম্বা-চওড়া মেয়ে। ভবতোষ তো ফিরে গিয়ে বলেনি যে পাত্রী এত সুন্দর। এরকম মেয়ের তো খুব ভালো জায়গায় বিয়ে হবার কথা।

বড়লোকদের বাড়িতে গিন্নি হলেই এ রকম সুন্দরী মেয়েদের মানায়, মটোরগাড়িতে চড়ে বেড়াবে, লাল রঙের সিল্কের শাড়ি পরবে, তার বদলে

সে হতে চলেছে কারখানার মিস্তিরির বউ !

যোগেনের এবার খেয়াল হলো, মেয়েটির সে নামই জানে না। চুনী বরাবরই বলে এসেছে তার খুড়তুতো বোন। নাম বলেনি একবারও। যোগেনও জানতে চায়নি। যোগেনের আনন্দ হবার বদলে একটু একটু দুঃখ হলো মেয়েটির জন্য। ওপার বাংলার মেয়ে, এখানে এসে বিপদে পড়েছে, গরিব...তাই এমন হুড়োহুড়ির বিয়ে...আহারে !

বাঙালদের বিয়েতে কি বেশি মন্ত্র থাকে। শেষ যেন হতেই চায় না। যোগেনের বেশ খিদে পেয়ে গেছে। বাঁটুলের চোখ থেকে যেন ঘুম উপে গেছে একেবারে। সাত পাক ঘোরার সময় সেও ঘুরলো বাবার সঙ্গে সঙ্গে। তাই নিয়ে অন্য মেয়েদের কি খিলখিল হাসি।

বাসরঘর যেটিকে করা হয়েছে, সেখানে প্রতিদিন কোচিং ক্লাস হয়। দেয়ালে ব্ল্যাক বোর্ড, একটা কেরোসিন কাঠের র‍্যাক ভর্তি বই, খাতাপত্তর। তার মাঝখানে দুটি চৌকি জোড়া দিয়ে বিছানা পাতা হয়েছে, বালিশের পাশে ফুলও ছড়ানো আছে চারটি।

বাসর-রাত জাগার কোনো ব্যাপার নেই। যজ্ঞ শেষ হবার পর রাত দুটোয় যোগেনকে খাইয়ে দাইয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ঐ ঘরে। খাটের এক পাশে বসে আছে নতুন বউ। একটি যুবতী মেয়ে ঘুমন্ত বাঁটুলকে নিয়ে এসে খাটে শুইয়ে দিল।

তারপর বললো, তিনজনে মিলে ফুলশয্যা !

অমনি দরজার আড়াল থেকে খিলখিল হাসি শোনা গেল।

বাঁটুলকে অন্য ঘরে রেখে আসার কথা বলে কোনো লাভ নেই। রাত্তিরে হিসি করার জন্য সে বার দুই জাগে। তখন পাশে বাবাকে না দেখতে পেলে কান্নাকাটি শুরু করে দেবে।

যুবতী মেয়েটি বললো, হ্যাজাকটা নিভিয়ে দিয়ে যাবো, না অমনি থাকবে ?

যোগেন জানে না হ্যাজাক কী করে কমাতে-বাড়াতে হয়। সে বল্লো, ওটা নিয়েই যান।

আবার দরজার বাইরে হাসির তরঙ্গ। যোগেন বুঝতে পারলো সে একটা কিছু ভুল বলেছে। এসময় সিদ্ধিনাথ আর ভবতোষ থাকলে ভালো হতো। ওরা নিশ্চয়ই এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

যুবতী মেয়েটি হ্যাজাকের শিখা অনেকখানি কমিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজা টেনে দিল বাইরে থেকে।

প্রথম বিয়েতে অন্যরকম ব্যাপার হয়েছিল। ঘরভর্তি ছিল অনেক লোক।

কয়েকজন গান গেয়েছিল, তাতেই কেটে গিয়েছিল সারা রাত। তাছাড়া লতিকাকে আগে থেকেই একটু একটু চিনতো যোগেন।

এখন যে ঠিক কী করতে হবে তা বুঝতে পারলো না। প্রথমেই ইচ্ছে করলো পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলতে। গরমে চ্যাটচেটে লাগছে। তার বরাবর খালি গায়ে ঘুমানো অভ্যেস।

যাই হোক, সে একটা সিগারেট ধরিয়ে খাটের ওপর বসে বললো, হ্যাঁ, তোমার নামটাই তো জানা হয়নি। নাম কী?

খাটের একপাশে মাটির দিকে মুখ করে পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে নববধূ। যোগেন দু-তিনবার জিজ্ঞেস করলেও সে কোনো উত্তর দিল না।

যোগেন বললো, নাম বলবে না? তা নাই বা বললে। আমি মনে মনে তোমার একটা নাম ঠিক করে ফেলেছি। তোমার নাম হবে ছবি।

এবারে নববধূ খুব আস্তে আস্তে বললো, আমার নাম চম্পাকলি।

—বাঃ, এটাও বেশ ভালো নাম। তবে আমি তোমায় ছবি বলেই ডাকবো। দাঁড়িয়ে থাকার দরকার কী। শুয়ে পড়লেই হয়। আমি এই সিগারেটটা শেষ করেই শোবো। চুনী তোমাদের আমার সম্পর্কে সব কিছু বলেছে?

উত্তর না দিয়ে নববধূ বোধহয় মাথা নেড়েছিল, যোগেন তা দেখতে পেল না। সে একমনে বলে চললো, তোমরা গরিব, আমিও গরিব। আমার তিনকুলে কেউ নেই। মামাদের বাড়িতে মানুষ হয়েছিলুম, এখন তারাও আর সম্পর্ক রাখে না, বাড়িতে গেলে বসতে বলে না পর্যন্ত। ছোটবেলায় আমাকে চাকরের মতন খাটাতো, এখনো সেই রকমই ভাবে আমাকে...থাক সে কথা। আমার ছোট সংসার। কোম্পানি কোয়ার্টার দিয়েছে, বাজারে আমার অনেক ধার, তবু ঠিক মতন দেখেশুনে যদি চালাতে পারো, তা হলে খাওয়া-পরার অভাব হবে না।

সরাসরি নতুন বউয়ের দিকে তাকাচ্ছে না যোগেন। তাই তার চোখ দিয়ে যে জল গড়াচ্ছে তা যোগেন টের পাচ্ছে না।

—হ্যাঁ, ইয়ে, তোমরা ওপার বাংলা থেকে চলে এলে কেন? এখন কি ওখানে কোনো গণ্ডগোল আছে?

কোনো উত্তর নেই।

যোগেন আবার সিদ্ধিনাথের অভাব বোধ করলো। সিদ্ধিনাথ গানটান গায়, সে উপস্থিত থাকলে হাসি-মস্করায় বেশ জমিয়ে দিতে পারতো। নিমকহারামের মতন সে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লো?

সিগারেটটা শেষ করে পা দিয়ে মাটিতে পিষে নেভালো যোগেন। হাই উঠছে। এখন ঘুমিয়ে পড়লেই হয়। নতুন বউয়ের সঙ্গে ভাব করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

চটি জোড়া খুলে সে দু'পায়ের পাতা ঘষে নিল ভালো করে। বাঁটুলের পাশে সরে এসে সে বললো, এই আমার ছেলে, এতদিন বড় কষ্ট পেয়েছে, আমি আর কতটুকু কী দেখতে শুনতে পারি। একে যদি নিজের ছেলের মতন মনে করে নাও তাহলে আমার কাছ থেকে কখনো খারাপ ব্যবহার পাবে না।

আড়চোখে এবার দেয়ালে হেলান দেওয়া নববধূর দিকে তাকালো যোগেন। এর তো শুয়ে পড়ার কোনো লক্ষণও নেই দেখা যাচ্ছে। থাক, যা ভালো বোঝে তাই করবে। হয়তো এদের নিয়মে প্রথম রাতে এক বিছানায় শুতে নেই।

পাশ ফিরে সে বললো, হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমার কিন্তু ঘুমুলে খুব নাক ডাকে। সে কথা আগেই বলে দিচ্ছি!

॥ ২ ॥

পরদিন সিদ্ধিনাথ সেই যে ব্যারাকপুরে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেল, আর ফিরলো না। ভবতোষও কলকাতায় দু'-একটা টুকিটাকি কাজ সারতে চায় বলে যোগেন একাই ফিরে এলো বউকে নিয়ে।

বিয়ের পিঁড়িতে বসে, ঘোমটার আড়াল সরিয়ে দৃষ্টি বদলের সময় নববধূকে দেখে যতটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল যোগেন, দিনের আলোয় আবার তাকে দেখে ঠিক সেই ভাবটা রইলো না। বিয়ের সাজে সব মেয়েকেই একটু রূপসী দেখায়। তবে বউ যথেষ্ট সুশ্রীই বটে, গায়ের রঙ ফর্সার দিকে, স্বাস্থ্য ভালো, চোখ দুটি টানা টানা, একমাথা চুল। যোগেনের মতন হেঁজিপেঁজি মানুষদের ঘরে এরকম বউ আসবার কথা নয়। মেয়েরা দেখতে শুনতে একটু ভালো হলেই অবস্থাপন্ন লোকেরা তাদের কিনে নিয়ে যায়।

এ মেয়ে যোগেনের ঘরে আসছে নিছক ভাগ্যের ফেরে।

যোগেন নিজের চেহারা কেমন তা বোঝে। সে জানে এরপর কুলটির লোকেরা নির্ঘাৎ বলবে, বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। তবু যোগেনের একটু একটু গর্ব হলো। এরপর কেউ কেউ তাকে হিংসে করবে। এ পর্যন্ত যোগেনের এমন কিছু ছিল না যাতে কেউ তাকে হিংসে করতে পারে।

পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধে হয়ে গেল।

আজ আর রান্নাবান্নার ঝামেলা করা যাবে না বলে স্টেশন থেকে আসবার

পথেই যোগেন পুরি আর তরকারি কিনে নিয়ে এলো। তালাবন্ধ ঘরে আলো জ্বলছে। ইলেকট্রিকের চার্জ লাগে না বলে সব সময় আলোর সুইচ অফ করার কথা খেয়াল থাকে না।

তালা খুলতে খুলতে যোগেন ছবির দিকে তাকালো। ওদের দেশ-গাঁয়ে নিশ্চয়ই বিজলি বাতি ছিল না, দেখুক, এখানে যত ইচ্ছে আলো খরচ করা যায়।

নতুন ঘরণীকে ঘরদোর সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো যোগেন। একটি শোওয়ার ঘর, আর একটি ছোট ঘর ভাঁড়ার আর গুদামের কাজে ব্যবহার করা হয়। আর এক চিলতে রান্নাঘর, পাশেই বাথরুম। সামনে একটু বারান্দা। গায়ে গায়ে কোয়ার্টার, পাশের বাড়ির কথাবার্তা এদের রান্নাঘরে বসে সব শোনা যায়।

বাঁটুলের সঙ্গে তার নতুন মায়ের এখনো ভাব জমেনি। নতুন মা যে কথাই বলতে চায় না। যোগেন যে এত কথা বলে যাচ্ছে, তার কোনো উত্তরই দেয় না ছবি। বাঁটুল তার নতুন মায়ের দিকে আড়ষ্টভাবে তাকায় আর বাবারই পাশ ঘেঁষে থাকে।

ট্রেনের জামাকাপড় ছেড়ে কারখানার পোশাক পরে নেয় যোগেন। পুরি আর তরকারি তিনখানা থালায় বেঁটে নিয়ে সে বলে, এসো, খেয়ে নেওয়া যাক। এই হপ্তাটা আমার নাইট ডিউটি। দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে থাকবে, কেউ ডাকলেও খুলবে না। বাঁটুল তো রইলোই। বুঝলি বাঁটুল, তুই নতুন মাকে পাহারা দিবি। পারবি না?

বাঁটুল একবার তার বাবা আর একবার এই নতুন মহিলাটির দিকে তাকায়। ব্যবস্থাটা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। তার বাবা বিয়ে করেছে তা ঠিক, তা বলে অন্য বাড়ির এই একজন এখন থেকে তাদের বাড়িতেই থাকবে কেন?

যোগেন বেরিয়ে যাবার পর ছবি মুখ খোলে। মগে করে জল নিয়ে এসে সে বাঁটুলকে বলে, নে, হাত ধুয়ে নে।

বাঁটুল বললো, আমি বাথরুমে গিয়ে হাত ধুতে পারি।

—তোর ভালো নাম কী?

—বাঁটুল।

—ওটা তো শুনেছি। তোর আর অন্য নাম নাই? আর একটা ভালো নাম দেয় নাই?

বাঁটুল ভুরু কুঁচকে গম্ভীরভাবে বললো, এইটাই তো ভালো নাম।

ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য একটু হেসে ছবি বললো, তুই যখন বড় হবি,

লম্বা হবি, তখনও তোর এই নাম থাকবে? মাইনষে খেপাবে। আমি তোর একটা ভালো নাম দেবো।

বাঁটুল বললো, আমার ভালো নাম চাই না।

—তুই ইস্কুলে যাস না?

—না। আমি কোথাও যাই না, বাড়িতে থাকি।

—তুই পড়তে জানোস? এ বি সি ডি জানোস?

—চারুদিদি আমাকে পড়ায়।

—চারুদিদি কে?

—ই কোয়ার্টারে থাকে। চারুদিদির কাছে গোপা, পান্তু, মিলনও পড়ে।

—এখানে ইস্কুল নাই?

—আছে। আমি ইস্কুলে যাবো না।

উঠে গিয়ে ছবি বিছানাটা পাততে লাগলো। দেয়ালে ঝুল জমেছে। খাটের নিচে রাজ্যের ময়লা জড়ো করা। ঘরের মধ্যে একটা ভ্যাপসা গন্ধ, ঘরের একদিকে মোটে জানলা।

বাঁটুল বললো, আমি বাবার সঙ্গে শোবো।

ছবি বললো, তুই আমার সঙ্গে শুবি না?

ঠিক তক্ষুণি এ বিষয়ে মতামত দিতে চাইলো না বাঁটুল। সে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বারান্দায়। তখনই দেখলো চারুদিদি বেরুচ্ছে পাশের কোয়ার্টার থেকে। বাঁটুল চেঁচিয়ে ডাকলো, চারুদিদি, চারুদিদি।

চারু সিদ্ধিনাথের বিধবা শ্যালিকা। তার স্বামী এক বাস দুর্ঘটনায় মারা গেছে বছর আড়াই আগে। কিন্তু এখনও চারুর মুখে সেই কঠোর শোকের ছাপ। রোগা, লম্বাটে মুখ, সাদা শাড়ি পরা চারুকে এখানে অনেকেই সমীহ করে কথা বলে। দিদির বাড়িতে আশ্রিতা হলেও চারু বিভিন্ন কোয়ার্টারে বাচ্চাদের পড়িয়ে নিজের খরচটা জোগাড় করে নেয়। তার নিজেরও বাঁটুলের বয়েসী একটি ছেলে আছে।

চারু এগিয়ে এসে বললো, বাঁটুল, তোর একজন মা আসার কথা ছিল না?

বাঁটুল ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, এসেছে।

চারু বললো, সে কি, আমরা কেউ খবর পেলুম না। নতুন বউ এমনি এমনি এসে গেল? জামাইবাবু ফিরলেন না। কই চল তো দেখি।

বাঁটুল আগ্রহ করে চারুদিদিকে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে।

ছবি নিশ্চয়ই ওদের কথা শুনেছে। সে আবার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। একগলা ঘোমটা দিয়ে।

চারু বললো, কই ভাই, দেখি তোমার মুখখানা দেখি? আমার নাম চারু, আমার জামাইবাবু গিয়েছিলেন তোমার বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে।

ছবি ঘোমটা সরালো না, নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

চারু বললো, এ আবার কেমন ধারা বিয়ে! বৌভাত হলো না, ফুলশয্যা হলো না, হুট করে দাদা বউ নিয়ে এলো। কই রে বাঁটুল, তোর বাবা কোথায়?

বাঁটুল বললো, বাবা নাইট ডিউটিতে গেছে।

—এসেই নাইট ডিউটি? নতুন বউ একলা একলা থাকবে? আশ্চর্য কাণ্ড! তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো। তোমার নাম কী?

ছবি এবারেও কোনো উত্তর দিল না। তার শরীরটা কাঁপছে।

চারু আরও কাছ এসে ঘোমটা সরিয়ে দিল। চোখ বুজেছিল ছবি, তার দুই গাল দিয়ে জলের ধারা বইছে, তবু সে চোখ মেলে তাকালো।

নবাগতা এই নারীর মুখ দেখে একটি কথাও বললো না চারু। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ছবির চোখের দিকে। দুই নারী বেশ কয়েকটি মুহূর্ত পরস্পরের দৃষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে কোন্ ভাষা বিনিময় করলো কে জানে। চারু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, বুঝেছি!

ছবি হঠাৎ আবার প্রবল কান্নায় নুয়ে পড়তে যেতেই চারু তাকে ধরে খাটে বসিয়ে দিল।

বাঁটুল বললো, ও বড্ড কাঁদে।

চারু বললো, তা তো কাঁদবেই। আরও কত কান্না বাকি আছে। মেয়েটাকে একেবারে জলে ফেলে দিয়েছে। বাপ-মা নেই বুঝি?

আর বেশি আদিখ্যেতা করলো না চারু। কোনারকম সান্ত্বনাও জানালো না। মিনিট দশেক থেকে চলে গেল,।

একটু বাদেই ফিরে এলো যোগেন। তার নাইট ডিউটি করা হয়নি।

কী করে যেন রটে গিয়েছিল যে সে আজই নতুন বউ এনে তাকে বাড়িতে একলা রেখে নাইট ডিউটি দিতে এসেছে। সহকর্মীরা সকলে মিলে ঠাট্টা-তামাশায় তাকে একেবারে জর্জরিত করে ফেলেছিল। এতে অস্বাভাবিক কী আছে তা যোগেন কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। ডিউটি থাকলে ডিউটিতে আসতে হবে না? নতুন বউ এসেছে, আস্তে আস্তে তাকে তো এসব মানিয়ে নিতে হবেই। যোগেন ছুটি খরচ করার ব্যাপারে বেশ কৃপণ।

শেষ পর্যন্ত তার সহকর্মীরা তাকে প্রায় ঠেলেই পাঠিয়ে দিয়েছে বাড়িতে। শিফ্‌ট ইন-চার্জ এমনভাবে হাসছিলেন যাতে যোগেনের মনে হয়েছে উনি তাকে আজকের রাতটা অন-ডিউটি দেখাবেন।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে যোগেনের মনে হচ্ছিল আর একজন কেউ থাকলে ভালো হতো। ছবি এত চুপচাপ, মাঝে মাঝেই কাঁদে, এর সঙ্গে কী করে ভাব জমাবে তা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। মেয়েটাও নতুন জায়গায় এসে পড়েছে, একটু দিশেহারা ভাব তো থাকবেই।

বাড়ি ফিরে এসে যোগেন ঘোষণা করলো, বাড়ি চলে এলাম। কারখানায় আজ ছুটি করে দিল!

ব্যস। এরপর যোগেন আর কথা খুঁজে পায় না।

ছবি শয়ন ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। বাঁটুল বললো, বাবা, জানো তো, ও আবার কাঁদছিল।

যোগেন বললো, হুঁ!

—বাবা, ও বলেছে আমাকে ইস্কুলে পাঠাবে।

—ও ও বলিস কেন? বলবি মা। ইস্কুলে তো যেতেই হবে। এখন তো আর কোনো অসুবিধে নেই, আমি কারখানায় গেলেও তোর নতুন মা তোর ভাত রান্না করে দেবে।

অপ্রাসঙ্গিকভাবে বাটুল এর পরেই বলে উঠলো, বাবা, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে শোবো!

অবাক হয়ে যোগেন বললো, তা তো শুবিই! তাছাড়া আর কোথায় শুবি? তোর ঘুম পেয়েছে তো বিছানায় উঠে শুয়ে পড়!

পাশের ঘরে ছবি এতক্ষণ কী করছে। কী সব যেন টানাটানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঐ ঘরটা অনেকদিন পরিষ্কার করা হয়নি।

সে ঘরের দরজায় উঁকি মেরে যোগেন দেখলো, কোথা থেকে যেন একটা মাদুর জোগাড় করেছে ছবি। ভাঁড়ার ঘরের মাঝখানটা পরিষ্কার করে একটা বিছানা পাতছে সেখানে। তার এক হাতে একটা বালিশ আর এক হাতে একটা ঝাঁটা।

যোগেন বললো, এ কী, এখানে... এসব কী হবে?

ছবি ঝাঁটা চালানো বন্ধ করে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

—এই বিছানায় কে শোবে? তুমি? না,না,না, এই তো কয়েক দিন আগে এই ঘরে অ্যাত্ত বড় একটা কাঁকড়া বিছে বেরিয়েছিল।

এবারে ছবি বিহ্বলভাবে এদিক ওদিক তাকালো। যোগেন তার হাত ধরে টেনে বললো, চলে এসো... সামনের অফ্ ডে-তে এই ঘরটা আমি পরিষ্কার করবো, তার আগে এখানে ঢুকবার দরকার নেই।

ছবির হাত ধরে যোগেন নিয়ে এলো পাশের ঘরে। ছবি বিশেষ আপত্তি জানালো না।

দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার পর যোগেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, আঃ!

আজ রাতে তার ঘুমোবার কথা ছিল না। হঠাৎ যেন এটা উপরি পাওনা হয়ে গেল। একটা ভুলে যাওয়া ওভারটাইমের বিল হঠাৎ পেলে মনটা যেমন আনন্দে ছলছল করে, যোগেনের এখন সেইরকম লাগছে। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একফালি আকাশ, সেখানে ঝলমল করছে নরম আলো।

যোগেন পাশ ফিরলো। ছবি নিশ্চয়ই জেগে আছে এখনো। মাঝখানে শুয়ে আছে বাঁটুল। ছবির সঙ্গে এখন খানিকটা মেলামেশা করা যেত। যোগেনের মনে পড়ে যাচ্ছে তার প্রথম বিয়ের প্রথম কয়েকটি দিনের কথা। সেই মনে পড়াটা সে টের পাচ্ছে তার শরীরে। কিন্তু বাঁটুল... ! এই প্রথম যোগেনের মনে হলো, এই রকমভাবে তো চলবে না, বাঁটুলকে এই বিছানা থেকে সরাতে হবে।

॥ ৩ ॥

প্রচণ্ড গরমে চারদিক একেবারে নিঃশব্দ। একটা কাকও ডাকছে না। সামনের মাঠটা গনগন করছে রোদে, তার মধ্য দিয়ে ছাতা মাথায় হেঁটে আসছে চারু। জানলার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকে একদৃষ্টিতে দেখছে ছবি।

মাস দেড়েক কেটে গেছে, এখন আর ছবি যখন তখন কাঁদে না। ঘরদোর অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছে। বিয়ের পর আর একবারও তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়নি। আবার কবে সে মা-ভাই-বোনদের দেখবে তার ঠিক নেই। জ্যাঠামশাই-এর বাড়িতে ওরা নিজেরাই যে আর কতদিন থাকতে পারবে তাই বা কে জানে।

চুনী দু'একবার এসে খোঁজ নিয়ে গেছে। তবে তার ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা গেছে, সে খুব একটা সম্পর্ক রাখতে চায় না। বিয়ে হবার হয়ে গেছে, এখন এদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে তার কোনো দায়িত্ব নিতে পারবে না চুনী।

এই সোমবার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে বাঁটুলকে। স্কুলের জন্য তার একটা ভালো নাম দরকার, ছবি ওর নাম দিয়েছিল সৌম্য। কিন্তু সে নাম যোগেনের পছন্দ হয়নি। সে নাম দিয়েছে কালীপ্রসাদ, বেশ ঠাকুরদেবতার নামে নাম। স্কুল কাছেই, বাঁটুলের যাওয়া-আসার কোনো অসুবিধে নেই।

এ পর্যন্ত একদিনও বাড়ি থেকে বেরোয়নি ছবি। কোথায় যাবে সে ? একমাত্র ভবতোষদের বাড়িতে একদিন ওদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল, কিন্তু সেখানেও যাওয়া হয়নি শেষ পর্যন্ত। ভবতোষের হঠাৎ মা মারা যাওয়ার খবর আসায় তার অশৌচ পড়ে গেল, নেমন্তন্নটা মুলতুবি রইলো।

ছবি শুধু জানলা দিয়ে বাইরের পৃথিবীটা দেখে। চোখের জল শুকিয়ে গেলেও একা থাকলেই তার ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তার জীবনে একটা অন্য স্বপ্ন ছিল।

চারু এদিকেই আসছে। এদিকে অন্য কোয়ার্টারেও চারু ছেলেমেয়ে পড়াতে আসে। কিন্তু তাদের দরজাতেই খটখট করে উঠলো।

ছবি দরজা খুলে দেবার আগে জিজ্ঞেস করলো, কে ? তারপর চারুর গলার আওয়াজ পেয়ে সে ছিটকিনি খুললো।

স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর বিষণ্ন মুখে চারু বললো, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে এলাম। আগে একটু জল খাওয়াও।

ছবি বললো, এই রোদ্দুরের মইধ্যে... এখনি জল খাবেন ? একটু পরে খান !

এদিককার গরমে ঘাম তেমন হয় না, মুখখানা পাংশু হয়ে গেছে চারুর। কোমরে গোঁজা রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো। চটি পরেই ঘরে ঢুকে চারু এদিক ওদিক চেয়ে বললো, তুমি আসবার পরেও ঘরটার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি দেখছি। তুমি সারাদিন কী করো ?

সময়ের মনে সময় কেটে যায়, ছবি সারাদিন সত্যিই কী করে ? বলার মতন কিছুই নেই বলে সে চুপ করে রইলো।

চারু এবারে ধমক দিয়ে বললো, তুমি বোবা নও তা জানি। কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দাও না কেন ? অত লজ্জা ভালো নয়, তার অন্য ব্যাখ্যা করে লোকে। গ্রাম থেকে শহরে এসেছো, এখন এখানকার রীতিনীতি শিখে নিতে হবে ! আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি সারাদিন কী করো ?

ছবি মৃদু গলায় বললো, কিছুই না !

—তুমি কিছু লেখাপড়া করেছো ? তোমাদের গ্রামে কি ছিল ইস্কুল-টিস্কুল ? যদি চাও তো আমি তোমাকে মাঝে মাঝে পড়িয়ে যেতে পারি। শুধু শুধু বসে সময় নষ্ট করবে কেন ? মোটামুটি অক্ষর পরিচয় করিয়ে দেবো আমি খুব তাড়াতাড়ি, তারপর নিজেই বই বা কাগজপত্তর পড়তে পারবে।

ছবি কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনলো এক গেলাস। সঙ্গে একটি প্লেটে কয়েকটি বাতাসা। বাঁটুল দুধের মধ্যে বাতাসা দিয়ে খেতে ভালোবাসে

বলে ঘরে বাতাসা কেনা থাকে।

জলের গেলাস নেবার পর চারু জিজ্ঞেস করলো, ওগুলো কী?

—শুধু জল খাবেন? একটু বাতাসা মুখে দিন!

চারু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তারপর বললো, কতকাল পরে এইরকম কথা শুনলুম। খুব ছোটবেলা হুগলিতে একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। কেন যে গিয়েছিলাম তা ঠিক মনে নেই। মনে আছে শুধু এই কথাটা, একটা বাড়িতে জল চেয়েছিলাম, অচেনা বাড়ি, তারা এক গেলাস জলের সঙ্গে একখানা চন্দ্রপুলি দিয়ে বলেছিল, শুধু জল খেতে নেই, একটু মিষ্টিমুখ করে নাও! এখন তো এরকম কথা কেউ বলে না। যে-কোনো বাড়িতে গিয়ে তুমি জল চাও, এমনকি আত্মীয়দের বাড়িতে, শুধু জলই দেবে!

একখানা বাতাসা মুখে দিল চারু। তারপর জিজ্ঞেস করলো, তুমি পড়বে আমার কাছে?

—পড়তে পারি। আপনি ওনাকে বলবেন, যদি বইপত্র কিনে দেয়।

—তুমি লেখাপড়া জানো কিছু?

—একটু একটু জানি।

—স্কুলেটুলে যেতে, না বাড়িতেই পড়েছো?

—আমি বরিশালে...ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিলাম কলেজে...তারপর বাবা মরে গেলেন, আর পড়া হলো না।

—অ্যাঁ?

ছবির মুখের দিকে একদৃষ্টিতে একটুক্ষণ চেয়ে রইলো চারু। তারপর আস্তে আস্তে বললো, তাহলে আর তোমাকে আমি কী পড়াবো? আমি নিজেই তো স্কুল ফাইনাল!

—তাও আপনি কত জানেন।

—তুমি...লেখাপড়া শিখেছো, তবু তুমি এরকম একটা বিয়েতে রাজি হলে? তোমার সম্পর্কে এর মধ্যেই কী সব রটনা শুরু হয়েছে তুমি জানো? তুমি ভেবো না আমি তোমার কাছে কূট-কচালি করতে এসেছি। এসব তোমার জানা দরকার। তোমরা ওপার বাংলা থেকে চলে এলে কেন, কোনো গণ্ডগোল হয়েছিল?

ছবি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো, না।

একটু থেমে আবার বললো, আমরা যে গ্রামে ছিলাম, সেখানে কখনো গোলমাল হয় নাই।

—তবে?

—আমাগো জায়গা-জমি ছিল না। বাবা মাস্টারি করতেন, উনি মরে গেলেন, অখন আমাগো খাওয়া-পরা জোটবে কোথা থিকা?

—এখানেই বা খাওয়াবে-পরাবে কে? তুমি কিছুটা অন্তত লেখাপড়া শিখেছিলে, একটা চাকরির চেষ্টা করতে পারতে? এখন তোমার মা আর ভাই-বোনদের কী অবস্থা হবে? মেয়েদের কি বিয়ে করা ছাড়া আর কোন গতি নেই? তাও বিয়ে করতে গেলে এই যোগেন মাইতিকে? ও যে শুধু হদ্দ কুচ্ছিৎ তাই তো নয়, মাথায় বুদ্ধি-শুদ্ধিও কিছু আছে? আগের বউটা মারা গেল, তার জন্য একদিনও কাঁদেনি, জানো? বউ যেদিন মারা গেল, তার পরের দিনেই কারখানায় ডিউটি করতে গিয়েছিল। ওদের সেকশনে সেদিন কে যেন মিষ্টি খাইয়েছিল, অনেকদিন পরে তার বউয়ের বাচ্চা হয়েছে বলে। অনেকে তো বলাবলি করেছিল, যোগেন মাইতি সেদিন ডিউটিতে গিয়েছিল ঐ মিষ্টি খাওয়ার লোভে। একটা হ্যাংলা অপদার্থ!

ছবি সামান্য একটু হাসলো। দ্বিতীয়বার বিয়ে করে এনেও তো সেদিনই নাইট ডিউটিতে গিয়েছিল যোগেন। সেদিনও কি কারখানায় খাওয়া-দাওয়া ছিল নাকি?

—এইসব ছোট জায়গায়, জানো তো, মেয়েরা একটু পরনিন্দার সুযোগ পেলেই জিভে একেবারে ধার দিয়ে বসে। তারা তোমার সম্বন্ধে কী বলছে জানো?

—কী?

—এই দ্যাখো। যোগেনের মতন মানুষেরও দ্বিতীয় বিয়ে হয়। কারণ, সে-পুরুষমানুষ। কোনো গুণ নেই তার। চাকরি করে সামান্য, আগের পক্ষের একটা বাচ্চা আছে, তবু তার তোমার মতন একটা বউ জুটে যায়। আর আমার কথা ভাবো, আমারও স্বামী নেই। একটি সন্তান আছে। আমি কি ইচ্ছে করলে আবার ঐ ইয়ে, মানে, কারুর সঙ্গে, ইয়ে, মানে বিয়ে হতে পারে? আমি সুন্দরী নই কিন্তু যোগেন মাইতির মতন কি অন্ধকারে দেখলে ভয় পাওয়ার মতন? পুরুষমানুষ যেমনই হোক তবু তাদের বিয়ে হতে পারে। বাচ্চা সমেত বিধবাদের কি বিয়ে হয়?

চারুকে যেন এবার নতুন আলোকে দেখলো ছবি। ওর কি যোগেন মাইতিকে বিয়ে করার সাধ ছিল? তাহলে ব্যাপারটা বেশ মানানসই হতো। দু'পক্ষেরই একটি করে সন্তান...। কেন হলো না?

ছবি একটা দীর্ঘশ্বাস মাঝপথে আটকে দিল।

চারু বললো, তোমার এমন তাড়াহুড়ো করে বিয়ে হলো, বেড়াল খেদিয়ে দেবার মতন তোমার বাড়ির লোক একটা যা-তা লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোমাকে পার করে দিল, এর কারণ নাকি তোমার চরিত্র নষ্ট। তুমি কারুর

সঙ্গে একবার বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলে। কিংবা তুমি একবার পেট নষ্ট করেছো। এসব আমার কথা নয়, অন্যরা বলছে, আমার কানে আসে। আমি জানি এসব সত্যি নয়। অভাবে পড়লে মানুষ কত অসহায় হয়ে যায় আমি জানি। লোকে খারাপ কথা বলতে ভালোবাসে। মেয়েরাই মেয়েদের বেশি শত্রুতা করে।

ছবির চোখ দিয়ে আবার নামলো জলের ধারা। তার অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

চারু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলো, আবার তুমি কথা না বলে কাঁদছো? মেয়েরা কেঁদে কেঁদেই গেল। কেঁদে তোমার কী সুরাহাটা হবে শুনি। লোকে মিথ্যে অপবাদ দিলেই কি তা মেনে নিতে হবে?

ছবি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো, মিথ্যা নয়, সত্যি।

—সত্যি? কী সত্যি?

—ওরা যা বলে।

—তার মানে....তুমি... তুমি কি সত্যি একবার অ্যাবরশন করিয়েছ?

—না। দ্যাশে থাকতে একজনের সাথে আমার ভাব হইছিল, আমারে বিয়া করতে চাইছিল!

—তবে তাকেই বিয়ে করলে না কেন?

—সে হিন্দু না। কিন্তু খুব ভালো বংশ।

—তোমার মা রাজি হলো না?

—মায় কইলো আত্মহত্যা করবে। গলার সামনে বঁটি ধরছিল।

—বুঝলুম। তারপর তোমরা তাড়াতাড়ি এপার বাংলায় চলে এলে? কিন্তু আর দু'-চারদিন দেখেশুনে বিয়ে দিতে পারলেন না তোমার মা? তুমি স্কুল ফাইনাল পাশ। চেহারাও খারাপ নয়, আর এই যোগেন মাইতি একটা মিস্তিরি, ফাইভ সিক্স পর্যন্ত পড়েছে কি না সন্দেহ...এক বাড়িতে চাকরের কাজ করতো সেই বাবু-ই ঢুকিয়ে দিয়েছে কারখানায়—।

ছবি এখন পাথর প্রতিমা। তার চোখে পলক পড়ছে না। সে চারুকে দেখছে না, তার দৃষ্টি অনেক দূরে। আপনমনে বললো, এদিকে আসার পর জ্যাঠামশাইর বাড়িতে কতরকম জ্বালাতন, কত মানুষ আমারে ছিঁড়া খাইয়া ফেলাইতে চায়। তাই আমি নিজেই মরতে গেলাম, শাড়িতে আগুন ধরাইয়া দিছিলাম, তবু মরতে পারলাম না। আমার বুকে পিঠে পোড়া দাগ আছে। এমনি দ্যাখলে বোঝা যায় না, কিন্তু আমিও কুৎসিত। আমার শরীর ঠিক আছে কিন্তু বুকের ভিতরটা পুইড়া নষ্ট হইয়া গ্যাছে।

চারুও অনেকটা আপনমনে বললো, হায় রে! একবার যারা আত্মহত্যা

করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, তারা আর দ্বিতীয়বার তা পারে না ! এই বিয়েটাই তোমার জীবন্ত মরণ।

ছবি চোখ নামিয়ে বললো, মানুষটা খারাপ না।

—কে ? কার কথা বলছো ?

—ইনি। এই বাড়ির লোক।

—আশ্চর্য, এর মধ্যেই পছন্দ হয়ে গেল ? জানি না বাবা, তোমাদের বাঙাল মেয়েদের কী রুচি, আমার তো যোগেন মাইতিকে দেখলেই গা জ্বলে যায়। কেমন যেন একটা ভ্যাতভেতে ভাব... আমি বাবা সত্যি কথা বলি।

—আমাকে বকে না, মারে না। আমি বইতে পড়ছি, কারখানার লোকেরা বউকে মারে !

—আসল চেহারা দেখবে একদিন, এখনই কি ! উঠি আমি—

—এখনই যাবেন ? রোদ্দুরটা পড়ুক।

—ছবি, একটা সত্যি কথা বলো তো। ওপার বাংলায় যার সঙ্গে তোমার ভাব-ভালোবাসা হয়েছিল, তার সঙ্গে কি তোমার আর সব কিছু হয়েছিল ?

—না, দিদি, মাথার কিরা, আর কিছু হয় নাই। তা বরং এপারেই হতে পারতো, সেইজন্যই আমি মরতে চাইছিলাম।

—তুমি যখন আমাকে সত্যি কথা বললে, তখন আমিও জীবনের একটা কথা বলি ! এই যে আমি আমার দিদি জামাইবাবুর বাড়ি আশ্রিতা হয়ে আছি, যদিও নিজের খরচ দিই, তবু আমার জামাইবাবু আমাকে তার জার করে রাখতে চেয়েছিলেন।

—কী কইলেন ? জার ?

—জার মানে জানো না ? রক্ষিতা। দিদি তো আছেই। আমাকেও ভোগ করবে।

—আপনের জামাইবাবু ?

—হ্যাঁগো। ঐ সিদ্ধিনাথ ঘোষ। সেই তো এসে রটিয়েছে যে তোমার আগে পেট হয়েছিল।

—দ্যাখলে তো মানুষটারে ভালোই মনে হয়।

—ঐ তো বললুম, মানুষ চেনা অত সহজ নয়। ঐ সিদ্ধিনাথ ঘোষ একটা নরখাদক, মেয়েমানুষ দেখলেই খেতে চায়। দেখো, তোমাকেও ছাড়বে না।

—মানুষ কেন এমন হয়, দিদি ?

—আমরা মেয়েরাই যে শক্ত হতে পারি না ! আর মেয়েরাই মেয়েদের সঙ্গে বেশি শত্রুতা করে। সিদ্ধিনাথকে সাবধান। আমাকে এখন যেতেই হবে। টিউশানি আছে।

এর পর থেকে চারু মাঝে মাঝেই আসে দুপুরের দিকে। চারুর সঙ্গে কথা বলে ছবি অনেক অভিজ্ঞ হয়ে উঠলো। চারুর তুলনায় ছবি বেশি লেখাপড়া জানে, বইও অনেক পড়েছে। ছবিদের গ্রামে অনেককাল থেকে মেয়েদের হাইস্কুল ছিল আগেকার কোনো এক জমিদারের নামে। পাঠাগারও ছিল। ছবির বাবা ইস্কুল মাস্টার ছিলেন বলে বাড়িতে একটা লেখাপড়ার আবহাওয়া ছিল। সেই তুলনায় চারু নিছক স্কুল ফাইনাল পাশ। কিন্তু চারুর মনের জোর অনেক বেশি। অনেক রকমভাবে পোড় খেয়ে সে আত্মরক্ষার নানারকম অস্ত্র তৈরি করার কথা চিন্তা করে। সে নিজে দুঃখ পেয়েছে বলেই অন্য দুঃখী মেয়েদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চায়।

ছবি কম কথা বলে কিন্তু তার বুদ্ধি তো কম নয়। সে চারুর একটা ব্যাপার বুঝে ফেলেছে। চারু পুরুষ-বিদ্বেষী, সে বাইরে এমন একটা কঠিন বর্মের মতন আবরণ করে রাখে যে অধিকাংশ পুরুষই তার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায়। কিন্তু চারুর ভেতরে ভেতরে একটা হাহাকার আছে। সে গোপনে গোপনে চায়, কোনো পুরুষ তার প্রতি মনোযোগ দিক, তার নির্জন সান্নিধ্য চাক। তবে সেই পুরুষটি যেন তার জামাইবাবু সিদ্ধিনাথ না হয়। দিদির বাড়িতে থেকে সে দিদির সর্বনাশ করতে কিছুতেই রাজি হবে না।

চারু যে যোগেনের এত নিন্দে করে, তাও কি বিপরীত প্রতিক্রিয়া! সে আসলে যোগেনের সংসারে স্থান নিতে চেয়েছিল? কিন্তু যোগেন মানুষটা এমন নয় যে নিজে থেকে কোনো উদ্যম নেবে। চুনী এসে প্রস্তাব না দিলে সে বোধহয় দ্বিতীয় বিয়ের কথা চিন্তাও করতো না। এমনকি এখনো যদি যোগেন চারু সম্পর্কে কিছুটা উৎসাহী হয়, তাতে ছবি দুঃখিত হবে না। তার কিছু যায় আসে না। ছবির যে বুকের মধ্যেটা পুড়ে গেছে!

চারুর কথাই সত্যি হলো, একদিন সিদ্ধিনাথ এসে হাজির হলো। তখন রাত এগারোটা। দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ করে সিদ্ধিনাথ বলতে লাগলো, দরজা খোলো, খোলো, আমায় যোগেনদা পাঠিয়েছে!

চারুকে দরজা খুলতেই হলো। বাঁটুল ঘুমিয়ে পড়েছে, যোগেন গেছে নাইট ডিউটিতে। রাত্তিরের নৈঃশব্দ্যে ঝিমঝিম করছে গোটা পাড়া। অনেক কোয়ার্টারেই এখন পুরুষমানুষ নেই।

সিদ্ধিনাথ পুরো মিথ্যে কথা বলেনি, যোগেনই পাঠিয়েছে তাকে। বিকেলে ওরা কয়েকজন গিয়েছিল কুমারডুবি, সেখানে আজ হাট। যোগেন বলে গিয়েছিল, ফিরতে দেরি হলে সে সোজা কারখানায় চলে যাবে। সেই কুমারডুবিতে কেনা একহাঁড়ি আখের গুড় যোগেন পাঠিয়েছে সিদ্ধিনাথের হাত দিয়ে। সিদ্ধিনাথের এখন কয়েকদিন ছুটি। তা বলে যোগেন কি

সিদ্ধিনাথকে রাত এগারোটায় যেতে বলেছিল?

সিদ্ধিনাথের চোখ লাল টকটকে, কথা জড়ানো। সিদ্ধিনাথ গাঁজাও টানে, মদও খায়, এখন যে ঠিক কোন নেশা করে এসেছে তা বোঝা যায় না। সিদ্ধিনাথের নিশ্চয়ই কিছু উপরি রোজগার আছে নইলে নেশার খরচ সে জোটায় কী করে?

ফুরফুরে হেসে সিদ্ধিনাথ বললো,এই যে গো, তোমার জন্যে ঘাড়ে করে এখো গুড় বয়ে নিয়ে এসেছি। যোগেনদা বললো, আমার বউ এট্টুখানি গুড় পেলে পুরো ভাত সাপটে দেয়, ডাল-তরকারি লাগে না! বউয়ের জন্য যোগেনদার খুব পীরিত!

গুড়ের নাগড়িটা রেখে দরজার পাশে দেয়ালে হাত দিয়ে দাঁড়ালো সিদ্ধিনাথ, রোগাটে পাকানো চেহারা, দেখে বয়েস বোঝা যায় না। খাকি প্যান্টের ওপর একটা সস্তার সিল্কের শার্ট পরে আছে, একদৃষ্টে চেয়ে রইলো ছবির চোখের দিকে।

গুড় পৌঁছে দেবার কথা, দিয়েছে, তারপরও মানুষটা চলে যায় না কেন, এত রাত হয়েছে? সিদ্ধিনাথের চোখ অন্য কথা বলছে, ছবি ঐ ভাষা বোঝে।

ছবি কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সিদ্ধিনাথ বললো, এক গেলাস জল!

সিদ্ধিনাথ অতি ধূর্ত। সে জানে, সে এমনই একটা জিনিস চেয়েছে, যা কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

জল আনতে যেতে হবে রান্নাঘরে, সিদ্ধিনাথ ছবিকে যাওয়ার পথ করে দিল। তারপর সেও ছবির সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো সেখানে।

মেঝেতে রাখা কুঁজো থেকে নিচু হয়ে জল গড়াচ্ছে ছবি, সিদ্ধিনাথ পাশ চোখে দেখছে তার স্তনের রেখা, তলপেট, নিতম্বের ডৌল। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল সিদ্ধিনাথের। এরকম একটা সুন্দর জিনিস, তা কিনা ঐ শ্মশানের মড়া যোগেনটার ভোগে লাগবে? পৃথিবীতে কি ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই?

জলের গেলাসটা নিয়ে সিদ্ধিনাথ বললো, এই রান্নাঘরটাই তো বেশ নিরিবিলি জায়গা, এখানে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি?

সিদ্ধিনাথ একটা হাত রাখলো ছবির কাঁধে।

ছবি সরে যাবার চেষ্টা করলো না, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সিদ্ধিনাথের মুখের দিকে।

সিদ্ধিনাথও একটুক্ষণ গাঢ়ভাবে চেয়ে রইলো। তারপর বললো, তোমার সঙ্গে আমার ভালো করে ভাবই হলো না এতদিনে। আমার কথা তোমার মনে পড়েনি?

ছবি কোনো উত্তর দিল না।

সিদ্ধিনাথ আবার বললো, তোমার বিয়ের দিন তোমাকে দেখেই ঠিক করেছিলুম, তোমাকে আমার চাই। আমিই তোমার যোগ্য মানুষ। আমার কথা শুনলে তোমার অনেক কিছু হবে বুঝলে ? তুমি আমার সঙ্গে আসানসোল যাবে ?

ছবি বললো, যদি উনি মত দেন তাহলে যাবো।

সিদ্ধিনাথ একগাল হেসে বললো, যোগেনটা একটা বোকাসোকা মানুষ। ওকে ভয় পাবার কিছু নেই। আসানসোলে আমরা ক'জনে মিলে একটা যাত্রা পার্টি খুলেছি, তোমাকে আমি সেখানে নিয়ে যাবো। তুমি নাচবে। পার্ট করবে। কেমন ?

ছবি সরলভাবে উত্তর দিল, আমি তো ঐসব কিছুই পারি না।

—আমি শিখিয়ে দেবো। সব পারবে ! ভয় নেই তোমার, যোগেনদাকে আমি যা বোঝাবো, ও তাই বুঝবে ! ওর বউ যাত্রায় নাচবে শুনলে খুশিই হবে, হে হে হে হে।

যেন এখুনি সে নাচ শিখিয়ে দিতে চায়, এইভাবে সিদ্ধিনাথ ছবির কোমরে হাত রাখলো।

ছবি বললো, এখান থেকে সব কথা পাশের কোয়ার্টারে শোনা যায়। চলেন, ও ঘরে যাই।

—ঐ ঘরে। ঠিক আছে চলো !

রান্নাঘর থেকে বারান্দায় এসে ছবি বললো, আপনে এখন বাড়ি যান। অনেক রাত....

সিদ্ধিনাথ বললো, এমন কিছু রাত্তির না, চলো, চলো। তোমার সঙ্গে সব কথা ঠিক করে নিই আজই। আমি সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেবো, তুমি শুধু আমার কথা শুনে চলবে।

পাছে ছবি দরজা বন্ধ করে দেয়, তাই সিদ্ধিনাথ আগেই শোওয়ার ঘরে ঢুকে মেঝেতে বসে পড়লো। তারপর পাশের জায়গাটা থাবড়ে বললো, তুমি এখানে এসে বসো !

ছবি চকিতে একবার তাকালো খাটের ওপর ঘুমন্ত বাঁটুলের দিকে।

সিদ্ধিনাথ বললো, কী ভাবছো, ছেলেটা জেগে উঠবে, এক কাজ করো, আলো নিভিয়ে দাও।

ছবি বললো, না। আপনে কাল সকালে আসবেন !

—কোনো অসুবিধে নেই। বলছি তো তোমাকে, আমি সব ম্যানেজ করে দেবো ! বাঁট্‌লো একবার ঘুমুলে সহজে জাগে না ! এখানে এসো।

—না।

—আলো নিভিয়ে দাও!

—না!

—দ্যাখ মাগী, বেশি সতীপনা দেখাসনি। তোর সব আমি জানি। যাদবপুরে তুই পাঁচ-ভাতারি হয়ে যাচ্ছিলি, তাই তোকে ঠেলে এখেনে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখানে কি তুই শুধু এক-ভাতারি হয়ে থাকবি?

—এইসব খারাপ কথা বইলেন না।

—খারাপ কথা? হে হে হে হে! ভুল হয়ে গিয়েছে। না গো, ছবিরানী, আর খারাপ কথা বলবো না। তুমি আমার কথা শুনে চলো, তাহলে তুমিও ভালো থাকবে। আমিও ভালো থাকবো। এখানে আমার পাশে এসে বসো।

—আজ না।

—কেন, আজ নয় কেন?

—আমার মাথার ঠিক নাই। আপনি যে কী বলতেছেন তার কিছুই আমার মাথায় ঢুকতেছে না।

—তা তো বটেই, মাথার ঠিক থাকবে কী করে? এইরকম একটা বিয়ে....এ যেন একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দেওয়া। যাই হোক, দুঃখ করো না, আমি তোমার মনের সাধ পূর্ণ করে দেবো! এসো—

—আজ না।

—ফের ছেনালিপনা করছিস? দেখবি মজা—

ছবি তার অস্ত্র আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল। সিদ্ধিনাথ উঠে দাঁড়িয়ে ঝট করে আলোর সুইচটা অফ করে দিতেই ছবি খাটের ওপরে বাঁটুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দু'হাতে তাকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললো, বাঁটুল, বাঁটুল, ওঠ, ওঠ, ঘরে বুঝি চোর ঢুকছে! চোর! চোর! চোর!

বাঁটুল ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে বললো, কী মা? কী? কই চোর? কোথায়?

অন্ধকারে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে গিয়ে সিদ্ধিনাথ দড়াম করে একটা ধাক্কা লাগালো।

ছবি বললো, ঐ যে, ঐ চোরটা পালায়—।

॥ ৪ ॥

বৃষ্টির সময় এই কারখানা-গ্রামটি ভারি অপরূপ হয়ে ওঠে। কোম্পানি অনেক যত্ন করে গাছপালা লাগিয়েছে, রাস্তাগুলি টানা টানা সোজা।

অফিসার পাড়া দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বিকেলবেলা বাড়ি ফিরছে

যোগেন। আজ তার মনটা বেশ ভালো আছে। বিয়ের পণের টাকায় সব ধার শোধ করে দিলেও সংসারে বেশ টানাটানি চলছিল তার। বাড়িতে বউ থাকলেই খরচ বাড়ে। লোকজন আসে, চা খাওয়াতে হয়। আগে সে আর বাঁটুল ডিমসেদ্ধ-ভাত খেয়ে নিত, এখন মাঝে মাঝেই ডাল তরকারি পাতে আসে। সেগুলো তো আর মাগনা আসে না। বাঁটুলের জন্য আবার দুধের বরাদ্দ করেছে ছবি।

যাই হোক, গত মাসে ধর্মঘটের হুমকিতে হঠাৎ ডি এ বেড়ে গেল, এরিয়ার নিয়ে সর্বসমেত সাড়ে ন'শো টাকা হাতে এসে গেল যোগেনের। এ যেন আকাশ থেকে খসে পড়া একখণ্ড হীরে। সেই টাকাটা কিসে কিসে খরচ করা হবে তা নিয়ে বেশি জল্পনা-কল্পনা করবার আগেই আড়াই শো টাকা দিয়ে নিজের জন্য একটা সেকেন্ড হ্যান্ড সাইকেল কিনে ফেলেছে যোগেন। অনেকদিন ধরে তার একটা সাইকেলের শখ।

ডি এ-র টাকাটা পাওয়ায় যোগেনের মনে হয়েছিল, তার দ্বিতীয় বউ পয়মন্ত। প্রথম বউটা তার হাড়-মাংস একেবারে চুষে-নিংড়ে নিয়ে গেছে, আর দ্বিতীয় বউ আসার কয়েক মাসের মধ্যেই এতগুলো টাকা ঘরে এলো! ওর জন্যও কিনে দিতে হবে একখানা লাল রঙের শাড়ি। ফর্সা মানুষদের লাল রং মানায়।

পাড়ার মধ্যে ঢুকে যোগেন দেখলো, তার কোয়ার্টারের সদরে তালাবন্ধ। দেখেই তার বুকখানা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। ঐ তালাটা যেন চরম কোন অশুভের চিহ্ন। ছবি তো এরকমভাবে কোনোদিন যায়নি। যোগেনকে কিছু না বলে সে এককথায় চলে গেল? ছবি তো রাস্তাও চেনে না।

সাইকেল থেকে নেমে দেয়ালে ভর দিয়ে অবসন্নভাবে দাঁড়ালো যোগেন। সে চোখে অন্ধকার দেখছে। ছবি যদি তাকে ছেড়ে চলে যায়, তা হলে সে কী করবে? প্রথম দিন থেকেই তার মনে মনে এরকম একটা আশঙ্কা ছিল, ছবি তার সংসারে বেশিদিন থাকবার জন্য আসেনি। এখানে আর পাঁচজনের চোখের চাহনি দেখেও যোগেনের সন্দেহটা পাকা হয়েছে। সবাই যেন বলতে চায়, ও বউ তোর যোগ্য নয় রে, যোগেন! আর কয়েকটা দিন সবুর কর, ডানা গজালেই পাখি উড়ে যাবে।

পাশের কোয়ার্টারের দশ-এগারো বছরের মেয়ে পাস্তি এসে বললো, ও যোগেনকাকা চাবি নেবে?

যোগেন সাগ্রহে বললো, চাবি? কিসের চাবি? আমার ঘরের চাবি তুই কোথায় পাবি?

পাস্তি বললো, কাকিমা রেখে গেছে। বললো যে, তুমি যদি হঠাৎ এসে

পড়ো, তোমায় দিতে।

—তাই বলে গেছে? কোথায় গেছে রে তোর নতুন কাকিমা!

—তা তো জানি না!

—কখন গেল?

—এই তো, খেয়েদেয়ে উঠে!

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল বেলা বারোটা থেকেই। বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গেছে ছবি? আজ সকালেও একটুও ইঙ্গিত দেয়নি।

তবে কি সিদ্ধিনাথের সঙ্গেই গেল? ছবি নিজেই একদিন বলেছিল যে সিদ্ধিনাথ তাকে আসানসোল নিয়ে যেতে চেয়েছে।

সিদ্ধিনাথ এ বাড়িতে ঘন ঘন আসতে শুরু করেছিল। যোগেনের অনুপস্থিতিতেই বেশি। ছবিই সেকথা বলে দিয়েছে যোগেনকে। সিদ্ধিনাথের চরিত্রের দোষের কথা সবাই জানে। কিন্তু সিদ্ধিনাথকে তো সে বাড়িতে আসতে নিষেধ করতে পারে না।

তালা খুলে ঘরে ঢুকে মাথা মুছলো যোগেন। তারপরই তার মনে পড়লো, একটু আগেই সে সিদ্ধিনাথকে কারখানায় দেখে এসেছে। সিদ্ধিনাথকে ভয় পায় যোগেন। সিদ্ধিনাথ ঠোঁটকাটা, দুঃসাহসী ধরনের মানুষ। সিফ্‌ট ইন-চার্জ, ফোরম্যানরা পর্যন্ত সিদ্ধিনাথকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। সিদ্ধিনাথের অনেক ভক্ত আছে। সে ইচ্ছে করলেই যে-কোনো একজনের বিরুদ্ধে অনেককে খেপিয়ে তুলতে পারে।

যোগেন যে এখন কী করবে তা ভেবেই পেল না। ছবির খোঁজ করতে যাবে? কোথায়? ছবি অনেকদিন একা বাজারে পর্যন্ত যায়নি.....।

যোগেন বিছানায় শুয়ে পড়লো।

আধঘণ্টা বাদে যোগেন ভাবলো, একবার চুনীর বাড়িটা দেখে আসা দরকার। যদি ছবি সেখানে যায়। চুনীর বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে, কিন্তু এখন যোগেনের সাইকেল আছে।

বিছানা থেকে উঠে জামাটা গায়ে দিতে গিয়ে মনে পড়লো বাঁটুলের কথা। বাঁটুল কোথায়? তার ইস্কুল তো অনেক আগেই ছুটি হয়ে যাবার কথা। এতক্ষণ বাঁটুলের কথা একবারও ভাবেনি।

দরজাটা হাট করে খুলে গেল। ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো চারু। তারপর সে বললো, কি গো, ঘুমোচ্ছো নাকি?

ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠলো যোগেনের। এই সময় চারু? তাকে কী বলবে যোগেন?

ঘরটা অন্ধকার অন্ধকার, চারু প্রথম যোগেনকে চিনতেই পারেনি। তা

ছাড়া এ সময় যোগেনের থাকবার কথা নয়। যোগেন হাফ-ডে করে চলে এসেছে আজ। কার কখন ডিউটি তা এখানকার সবাই জানে, চারুও জানে।

চারু তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে?

কাঁপা কাঁপা গলায় যোগেন বললো, আমি—।

চারু এক পা এগিয়ে এসে যোগেনকে ভালো করে দেখলো। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বললো, এই সময়ে.....বাড়িতে.....আমি বুঝতেই পারিনি.....ছবি কোথায়? পাশের ঘরে?

যোগেন বললো, না, ছবি নেই।

—ছবি নেই? কোথায় গেলে?

—কী জানি, কোথায় যেন গেছে।

—ছবি কোথায় গেছে, আপনাকে বলে যায়নি? আশ্চর্য তো!

—আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি জানো। তোমার সঙ্গে তো কথাটথা বলে!

চারু যোগেনের দিকে সরাসরি তাকিয়ে অনুচ্চ গলায় হাসলো। কিসের জন্য যে এই হাসি তা বোঝা গেল না। চারু আর কোনো কথাও বললো না, একভাবে তাকিয়েই রইলো। যোগেন কোণঠাসা বেড়ালের মতন খাটের পাশে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ পেছন ফিরে চারু বললো, আমি যাই!

যোগেন দুর্বলভাবে জিজ্ঞেস করলো, ও চারু, ও কোথায় যেতে পারে বলো তো?

চারু মুখঝামটা দিয়ে বলে গেল, আমি তার কী জানি!

যোগেনের একবার ইচ্ছে হলো চারুকে আটকায়, তার কাছ থেকে বুদ্ধি নেয়। কিন্তু চারুকে সে রকম অনুরোধ করার সাহস হলো না।

চুনীর বাড়িতে যাওয়ার উৎসাহও সে হারিয়ে ফেললো। যদি সেখানে গিয়ে দেখে যে ছবি নেই, তাহলে তো আর কোনো আশাই থাকবে না।

যোগেন চলে এলো রান্নাঘরে। তার খিদে পেয়ে গেছে। সে দেখলো, উনুনের পাশে রাত্তিরের জন্যে রুটি করে রাখা আছে। দু'খানা রুটি সে গুড় দিয়ে খেয়ে ফেললো। তারপর আরও দু'খানা রুটি নিল। তারপর বড় এক গ্লাস জল খাবার পর তার মনটা তৃপ্ত হয়ে গেল। এতক্ষণ সে বেশি বেশি ভয় পাচ্ছিল, বাঁটুলও যখন বাড়িতে নেই, তখন বাঁটুলের সঙ্গেই ছবি কোথাও গেছে। এত চিন্তা করার কী আছে?

ইদানীং বাঁটুলকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করছে ছবি। বিয়ে করে আনার পর ছবিকে বলে দিয়েছিল যোগেন, সে যেন বাঁটুলের যত্ন নেয় সব সময়। কেউ যেন সৎ মা বলে ছবির দোষ দিতে না পারে। মা-মরা ছেলে বাঁটুল

একটু জেদী হয়েছে, অনেক সময় অন্যায় আবদার করে তবু মানিয়ে চলতে হবে তার সঙ্গে।

প্রথম প্রথম যোগেন লক্ষ্য করেছে, বাঁটুলের সঙ্গে ছবির ঠিক যেন বনছিল না। বাঁটুল তার বাবার প্রতি অধিকারের খানিকটা অংশ তার নতুন মা-কে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। এক-একদিন বাবার কাছে নতুন মার নামে মিথ্যে মিথ্যে নালিশ করেছে বাঁটুল। ছবিকে মৃদু বকুনি দিলে মাথা নিচু করে মেনে নিয়েছে ছবি।

এখন বাঁটুল আর নতুন মা বলে না, শুধু মা বলে। বাড়ি ফিরে যোগেন প্রায়ই দেখছে যে লুডো খেলতে বসে বাঁটুলের সঙ্গে ঝগড়া করে ছবি। ঠিক যেন দুই পিঠোপিঠি ভাই-বোন। বাথরুমে বাঁটুলকে স্নান করাতে নিয়ে গিয়ে ছবি প্রায় একঘণ্টা সময় কাটিয়ে দেয়। দু'জনে খলখল করে হাসে।

বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রীর আসল সম্পর্কটা পাতাতে পারেনি যোগেন। রাত্তিরে বাঁটুল মাঝখানে শোয়। যোগেন অনেক রাত পর্যন্ত পা নাচায়, হাত বাড়িয়ে ছবিকে ধরতে গেলেও সে সাড়া দেয় না।

একদিন বেলা এগারোটায়, বাঁটুল ইস্কুলে চলে যাবার পরে ছবিকে চেপে ধরেছিল যোগেন।

ছবি ঠাণ্ডাভাবে বলেছিল, না, ওসব না।

যোগেন অবাক হয়ে বলেছিল, কেন?

ছবি মুখটা অন্য পাশে ফিরিয়ে বলেছিল, ভয় ক'রে, আমার ভয় করে।

—এতে ভয়ের কী আছে? বিয়ের পরে এসব করতে হয়। আস্তে আস্তে ভয় কেটে যাবে।

—যদি বাচ্চা হয়ে যায়?

—হয় তো ভালোই। তুমি মা হতে চাও না? তোমার বুকে একটা এইটুকুনি বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরবে, দেখো তোমার কত আনন্দ হবে।

—এখন না। এখন ওসব না।

—আরে, এ মেয়ে তো পাগল দেখছি। ভয়ের কিছু নেই, এসো, এসো। আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—এখন বাঁটুল আছে। আমার বাচ্চা হলে বাঁটুলের কষ্ট হবে। ওর দেখাশোনা হবে না।

যোগেন একটু জোর করতে গেছে ছবি দৃঢ়ভাবে বলেছিল, না, আমি এখন সন্তান চাই না। বাঁটুল বড় হউক আরেকটু—

যোগেন আর বেশি দূর এগোতে সাহস পায়নি।

ছবির গায়ে একটু হাত ছোঁয়ালেই ছবির যেন ছ্যাঁকা লাগে, সে অমনি সরে যায়। এই ব্যাপারটাও বুঝতে পারে না যোগেন। ছবি কি তাকে এতই অপছন্দ করে অথচ যত্ন করে তো বেশ। যোগেন পোস্ত খেতে ভালোবাসে, তাই প্রায়ই ঝিঙে পোস্ত কিংবা পোস্ত বাটা তৈরি করে ছবি। যোগেন কিছু না বলতেই ছবি ওর জামার বোতাম লাগিয়ে দেয়, খাকি প্যান্টের হাঁটুর কাছে ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেটাকে বেশ যত্ন করে সেলাই করেছে।

প্রথম প্রথম এসে ছবি প্রায়ই কাঁদতো, এখন আর কাঁদে না। বাড়িতে প্রায়ই তার হাসির শব্দ পাওয়া যায়। সে তাহলে বিয়েটা ভালোমনেই মেনে নিয়েছে। একবারও মায়ের কাছে যাবার কথা বলেনি। কলকাতার ওপর তার সেরকম টান নেই। তবু সে কেন যোগেনকে পুরোপুরি স্বামীর অধিকার দিচ্ছে না?

যতদিন যাচ্ছে যোগেনের চেয়ে ছবির সঙ্গেই বাঁটুলের ভাব হচ্ছে বেশি। ওরা দু'জন যেন আলাদা আর যোগেন আলাদা। যোগেন এই ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারে না। দ্বিতীয় বিয়ে ঠিক করার পর অনেকেই বলেছিল, দেখো বাপু, আনছো তো আরেক জনকে, কিন্তু তোমার ছেলেটার কী হাল হবে.....। সৎমা কখনো আপন হয়? যে-সন্তানকে নিজের বুকের দুধ খাওয়ায়নি, তার প্রতি কখনো মায়াদয়া হতে পারে না।

কিন্তু এখন এক একদিন যোগেনের বাড়ি ফিরে মনে হয়, মা আর ছেলে এমন দু'জনে মশগুল হয়ে আছে যে সেখানে যোগেনের উপস্থিতির কোনো মূল্যই নেই।

আজও যে যোগেন বৃষ্টির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে এবং নতুন সাইকেল কেনার আনন্দে অসময়ে বাড়ি চলে এলো, আজও যোগেনের জন্য ওরা কেউ অপেক্ষা করে নেই।

যোগেন দরজার কাছে বসে রইলো রাস্তার দিকে চেয়ে।

বৃষ্টি ধরে গেছে। শেষ বিকেলের উজ্জ্বল আলোয় সমস্ত আকাশটাকে পেছনে রেখে বাড়ি ফিরছে বাঁটুল আর ছবি। বাঁটুল মনের আনন্দে লাফাচ্ছে আর তার পেছনে পেছনে প্রায় ছুটে আসছে ছবি, ঠিক যেন একটি অল্প বয়েসী বালিকা।

অপেক্ষার ছটফটানি থেকে আস্তে আস্তে বেশ রাগ জমেছে যোগেনের মনে। আজকের সমস্ত আনন্দটাই নষ্ট করে দিল ওরা দু'জনে। তাছাড়া ধিঙ্গি মেয়েমানুষের মতন ছবি এরকম বাড়ির বাইরে বেরুবেই বা কেন?

দূর থেকেই বাঁটুল চিৎকার করে ডাকলো, বা—বা!

ছবি মাথায় একটু ঘোমটা টেনে দিল।

—কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

ছবির বদলে বাঁটুলই বললো, মা-কে আমি বড় রাস্তা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

—বড় রাস্তা?

—জিটি রোড! আমরা সেখানে কতক্ষণ বসে রইলুম।

ছবি তো জানে না যে যোগেন রেগে আছে, তাই সে খানিকটা ছেলেমানুষী উচ্ছলতার সঙ্গে বললো, বাবারে, কত বড় রাস্তা, একদিকে কলকাতা, আর একদিকে সেই দিল্লি। গাড়িগুলো অতদূর যায়?

বাঁটুল বললো, জানো বাবা, আজ জাম হয়েছিল।

—কী?

—জাম, জাম! কত্ত গাড়ি! একশো-দুশো গাড়ি, আর লরি আর বাস, সব থেমে আছে, লোকেরা নেমে পড়েছে।

—সেখানে তোমরা কী করছিলে?

—দেখছিলাম!

যোগেন গম্ভীরভাবে ছবিকে জিজ্ঞেস করলো, অতদূরে ছেলেটাকে নিয়ে গিয়েছিলে কেন? আমাকে একবার জিজ্ঞেস করোনি পর্যন্ত!

যোগেনকে অবাক করে দিয়ে ছবি উত্তর দিল, এ আবার জিজ্ঞাসা করার কী আছে? এর মধ্যে দোষের কী আছে?

—তার মানে?

—একজন আমাকে আসানসোল নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সে কথা আপনেরে বলেছি। ছেলের সঙ্গে কোথাও যেতে হলেও কি তা জিজ্ঞাসা করতে হবে?

—তা বলে দুপুরবেলা বাড়ি ছেড়ে অতদূরে যাবে?

—দুপুরে আপনে বাড়ি থাকেন না, বাঁটুলও এই গরমে ঘরে থাকতে চায় না, ছটফট করে। ওকে একলা কোথায় ছেড়ে দিই, তাই আমি ওর সঙ্গেই যাই। এদিক ওদিক ঘুরি।

যোগেন লক্ষ্য করলো, ছবির মুখটা আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে। খাঁচার থেকে কোনো পাখি ছাড়া পেলে তাকে বুঝি এইরকমই দেখায়। যোগেনের খুব ইচ্ছে হলো, হাত বাড়িয়ে এক্ষুণি সে ছবিকে খুব জোরে চেপে ধরে। সে ওকে ছেড়ে দেবে না, কিছুতেই যেতে দেবে না অন্য কোথাও!

বাঁটুল বললো, বাবা, একদিন আমরা এস্টেশানে গেসলুম! মাকে বললুম, চলো মা, আমরা টিকিট কেটে কলকাতা চলে যাই। মা বললো, পয়সা নেই!

যোগেন বিস্ফারিত চোখে ছেলে ও স্ত্রীর দিকে পর্যায়ক্রমে তাকালো। এরা দু'জন তার অভিজ্ঞতার বাইরে চলে যাচ্ছে। লাজুক, জড়োসড়ো মেয়ে ছবি, সে এখন রেল স্টেশান পর্যন্ত চেনে। হাতে পয়সা থাকলে টিকিট কেটে কলকাতাতেও চলে যেতে পারে। জিটি রোড দিয়ে কত বাস যায়...... ।

তখনকার মতন আর কিছু বললো না যোগেন। গুম হয়ে রইলো। মা আর ছেলে কল-কোলাহল করতে লাগলো ঘরের মধ্যে। আজকাল ছবির মুখ ফুটেছে, অবশ্য ছেলের সঙ্গেই বেশি কথা বলে।

বাঁটুলের হাত-পা ধুইয়ে দিল ছবি। জোর করে দু'খানা রুটি খাওয়ালো। তারপর পড়তে বসালো।

বাঁটুলের নিজের মা কিছুই লেখাপড়া জানতো না, তার দ্বিতীয় মা তাকে ইংরিজি বানান শেখাচ্ছে।

তারপর একসময় রাত্রি গাঢ় হলো। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলো, শুয়ে পড়লো বাঁটুল। ছবি এসে রান্নাঘরের টুকিটাকি কাজ সারছে, তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যোগেন দেখতে লাগলো তার স্ত্রীকে। এখন তার দৃষ্টি ঠিক সিদ্ধিনাথের মতন।

সে বললো, তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে কয়েকটা কথা বলি এখানে। ওঘরে তো বাঁটুলের সামনে সব কথা বলা যায় না।

ছবি একবার রান্নাঘরের জানলাটার দিকে তাকালো। মৃদু গলায় বললো, সব ওরা শুনতে পাবে।

সেদিকটা গ্রাহ্য না করে যোগেন বললো, তুমি এই যে দুপুরে বাড়ি থাকো না, এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াও, এতে লোকে তোমার বদনাম দেবে!

ছবি বললো, আপনাদের দ্যাশে ছেলের সাথে মা বেড়াতে গ্যালেও বুঝি বদনাম দেয়!

একটু থতমতো খেয়ে গেল যোগেন। না, এরকম ভাবে ঠিক বলা যায় না। ছবিরও তো বয়েস বেশি নয়, পাশাপাশি বাঁটুলকে আর ওকে দেখলে ভাই-বোনও মনে হতে পারে।

রান্নাঘরের আলো নিভিয়ে বেরিয়ে আসে ছবি।

ভাঁড়ারঘরটা সাফ-সুতরো করা হয়েছে, এখন আর কাঁকড়া বিছের ভয় নেই। ছবি সেই ঘরে ঢুকতেই যোগেন বললো, এখন এখানে বাঁটুলের জন্য একটা বিছানা পেতে দিতে পারো।

স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ছবি বললো, বাঁটুল এখানে একা শোবে? মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে ও আপনাকে না দেখলে কাঁদে।

—এখন আর কাঁদে না। আমি তো নাইট ডিউটিতে যাই।

—এখন ওর পাশে আমি থাকি।

হঠাৎ ছবির হাত জড়িয়ে ধরে যোগেন বললো, শোনো ছবি, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো?

ছবি এ কথার কোনো উত্তর দিল না। বাঁটুলের ইস্কুলের জামা-কাপড় ইস্ত্রি করতে লাগলো একমনে।

পেছন দিক থেকে ছবিকে জড়িয়ে ধরে যোগেন বললো, তোমার কিছু ভয় নেই। আমাদের আর একটা বাচ্চা হলে আমরা ঠিকই মানুষ করতে পারবো।

নিজেকে আলতোভাবে সরিয়ে নিতে নিতে ছবি বললো, এখনে সময় হয় নাই।

—কেন, গত মাস থেকে আমাদের ডি এ বেড়েছে।

—আমার মন এখনো ঠিক নাই। বুকে পোড়া-পোড়া দাগ।

—ওসব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার বুকে একটু একটু কালো ছোপ আছে শুধু, আমি না হয় হাসপাতালের লেডি ডাক্তার দেখিয়ে মলম এনে দেবো

—আপনি জোর করবেন না। বলছি তো এখনও সময় হয় নাই।

—আমি আর পারছি না ছবি!

পাশের ঘর থেকে বাঁটুল মা মা বলে ডেকে উঠলো। ছবি বললো, ছাড়েন, বাঁটুল জেগে উঠেছে।

—উঠুক, একটু পরে যেও!

—ও যদি দ্যাখে পাশে আপনেও নাই, আমিও নাই, তা হলে ও ভয় পাবে!

—ও তো আমাকে ডাকলো না, তোমাকেই ডাকলো।

—চলেন, ওঘরে যাই!

যোগেন চিৎকার করে বলে উঠলো, নাঃ!

এত জোরে সে কখনো কথা বলেনি ছবির সঙ্গে। বলেই সে সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে মুখ ঢাকলো। ছবির মুখে কিন্তু চাপা হাসি খেলা করছে।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে যোগেন ক্লান্তভাবে বললো, ছেলেটা পর হয়ে গেল! নিমকহারাম! ও ছেলের পাশে আর আমার শুতে ইচ্ছে করে না। তুমি এই ঘরে আমার বিছানা পেতে দাও, এখন থেকে আমি এ ঘরেই শোবো। তোমরা মা আর ছেলেতে একসঙ্গে থাকো গিয়ে!